খাদ্য ও পুষ্টি সহায়িকা

UPP-Ujjibito Component

Food Security 2012 Bangladesh – Ujjibito Project

বাস্তবায়নে

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	ফ্লিপ চার্ট মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্য	৩
২.	ফ্লিপ চার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী	৩
৩.	খাদ্য ও পুষ্টি	৪-৫
৪.	সুষম খাবার	৬-৭
৫.	সমান পুষ্টিমানের দামী ও সস্তা খাবার	৮-৯
৬.	রান্নার পূর্বপ্রস্তুতি ও রান্নায় সতর্কতা অবলম্বন	১০-১১
৭.	কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি	১২-১৩
৮.	গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি	১৪-১৫
৯.	গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যা	১৬-১৭
১০.	নবজাতকের পরিচর্যা	১৮-১৯
১১.	নবজাতকের পুষ্টি	২০-২১
১২.	বয়স অনুযায়ী শিশুর পুষ্টি	২২-২৩
১৩.	শিশুর সঠিক বৃদ্ধি	২৪-২৫
১৪.	শিশুর অপুষ্টি : ধরন, কারণ ও প্রতিকার	২৬-২৭
	❑ শিশুর হাড্ডিসার ও গা-ফোলা রোগ	২৮-২৯
	❑ আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা	৩০-৩১
	❑ ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ	৩২-৩৩
	❑ আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা	৩৪-৩৫
	❑ ভিটামিন ‘সি’ ও ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবজনিত রোগ	৩৬-৩৭
১৫.	শিশুর ডায়রিয়া	৩৮-৩৯
১৬.	শিশুর নিউমোনিয়া	৪০-৪১
১৭.	পরিবারে কৃমি প্রতিরোধ	৪২-৪৩
১৮.	শিশু, কিশোরী ও মায়ের টিকা	৪৪-৪৫
১৯.	পরিবার পরিকল্পনা	৪৬-৪৭
২০.	যক্ষ্মা	৪৮-৪৯
২১.	নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	৫০-৫১
২২.	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস	৫২-৫৩
২৩.	রেফারেল	৫৪-৫৫
২৪.	স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় দিবসসমূহ	৫৬-৫৭

ফ্লিপচার্টের ব্যবহার বিধি

ফ্লিপ চার্ট মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্য

'Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito)' শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন এবং স্থানীয় সরকার যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অংশের নাম Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito । এই কম্পোনেন্ট-এর ৩টি কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের একটি হলো, ৩২৫,০০০ অতিদরিদ্র নারী-উপকারভোগী এবং তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উল্লেখযোগ্য ও টেকসই উন্নয়ন। এই উন্নয়নের লক্ষ্যে লক্ষিতগোষ্ঠীর ও তাদের খানার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখাই মাঠ পর্যায়ে এই ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের উদ্দেশ্য।

বিশেষ উদ্দেশ্য

- অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের বিশেষত মহিলা সদস্যদের খাদ্যের উপাদানসমূহ, উহার গুরুত্ব, সহজলভ্য উৎস এবং খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো
- অপুষ্টিজনিত এবং অপুষ্টির জন্য দায়ী বিভিন্ন রোগের কারণ, লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জানানো
- বিশেষ পুষ্টি প্রয়োজন এমন জনগোষ্ঠী, যথা: গর্ভবতী, প্রসূতি, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা, খাদ্য তালিকা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা সম্পর্কে জানানো
- স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে জানানো
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত ও দলীয় আলোচনাকে ছবি ও বার্তার মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং হৃদয়স্পর্শী ও গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বেশি শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা
- স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের কৌশল ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা

ফ্লিপ চার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী

এই ফ্লিপ চার্টটিতে একদিকে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ ও আকর্ষণীয় রঙিন ছবি দেওয়া আছে এবং বিপরীত দিকে কর্মীদের জন্য ছবিগুলোর বক্তব্য ও অন্যান্য তথ্য বিশেষভাবে দেওয়া আছে যা তাদের দলীয় আলোচনা পরিচালনায় সহায়ক হবে। কর্মীদের সুবিধার জন্য ছবিগুলোর নিচে ক্যাপশন দেওয়া আছে।

ফ্লিপ চার্টটি কোথায়, কখন এবং কিভাবে ব্যবহার করবেন

- ফ্লিপ চার্টটি ব্যবহারের আগে নিজে ভালোভাবে পড়ে ছবিগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ভালোভাবে বুঝে নিন। কিভাবে দলীয় আলোচনায় বক্তব্য উপস্থাপন করবেন তা নিজে অনুশীলন করে ভালোভাবে রপ্ত করুন।
- দলীয় আলোচনার শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের 'U' আকারে বসার ব্যবস্থা করুন।
- বক্তব্য শুরু করার আগে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং পরিচয়ের মাধ্যমে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করুন।
- সময় এবং প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচিত বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখুন, এক অধিবেশনে অধিক বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন না।
- নির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ধারণা ও জ্ঞান যাচাই করার জন্য প্রথমে তাদের প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন।
- বক্তব্যের সময় বইটি আপনার বাম হাতে রাখুন, ডান হাতের সাহায্যে পৃষ্ঠা উল্টান এবং একের পর এক ছবি বক্তব্যের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন। এমনভাবে বইটি ধরুন যেন সকলে ছবিগুলো দেখতে পান।
- ছবির পিছনের লেখাগুলো আপনার বক্তব্যকে সহজতর করার জন্য সহায়ক। আপনি সেগুলো এমনভাবে দেখবেন যেন উপকারভোগীদের দিকে আপনার লক্ষ্য থাকে । আলোচনায় স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করুন।
- গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বারবার বলুন, তবে আলোচনা অযথা দীর্ঘায়িত করবেন না।
- আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের ভিতর হতে তার উত্তর নেয়ার চেষ্টা করুন। অংশগ্রহণকারীদের কোনরকম সমস্যা হলে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করুন।
- কোন অংশগ্রহণকারী অমনোযোগী থাকলে তাকে সুকৌশলে উৎসাহ দিন এবং প্রশ্ন করে মনযোগী করার চেষ্টা করুন।
- যদি কেউ আপনার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তাহলে তার কাছ থেকে জানতে হবে কিভাবে তার এ ধারণা মনে জেগেছে। যদি আপনি মনে করেন তার ধারণা অমূলক তখন যুক্তির সাহায্যে ভুল ধারণা খণ্ডন করুন। কিন্তু সতর্কতার সাথে বিবাদ এড়িয়ে যাবেন। প্রয়োজন হলে পরে এই বিষয়ে আলোচনা করুন। কখনই ধৈর্য হারাবেন না।
- মনে রাখবেন আপনার উদ্দেশ্য জ্ঞান বৃদ্ধি করা, আগ্রহ বাড়ানো এবং বাস্তবায়নের জন্য পথ প্রদর্শন করা।
- আপনার সমগ্র আলোচনা থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কতটা শিখলেন বা বুঝলেন তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিন এবং সর্বশেষে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে হাসিমুখে বিদায় নিন।
- অংশগ্রহণকারীগণ পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান তাদের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু কাজে লাগাচ্ছেন তা পর্যবেক্ষণ করুন।
- ফ্লিপ চার্টটি একক ও দলীয় আলোচনা উভয় ক্ষেত্রেই সহায়িকা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- ফ্লিপ চার্টের বিষয়গুলো ও এর উপস্থাপন পদ্ধতি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে প্রদত্ত 'পুষ্টি বিষয়ক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা'/গাইডলাইন ব্যবহার করুন।

খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য কি?

শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য আমরা যা খাই তাই খাদ্য। সহজ কথায় যা খেলে আমাদের শরীরের শক্তি বাড়ে, বৃদ্ধি পায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে তাই খাদ্য।

পুষ্টি কি?

পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শরীর খাদ্য গ্রহণ করে, পরিপাক করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান শোষণ করে শরীরের কাজ করার শক্তি যোগায়, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে । এককথায়, পুষ্টি বলতে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের ফলাফলকে বোঝায়।

অপুষ্টির কারণসমূহ

- পুষ্টিকর খাবারের অভাব
- সংক্রামক রোগ, যেমন - ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, হাম
- দরিদ্রতা
- স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব
- যত্নের অভাব
- নিরাপদ পানি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব
- স্বাস্থ্যসেবার অপর্যাপ্ততা
- কুসংস্কার
- কৃমি

মনে রাখতে হবে

- ❖ শরীরে শক্তির জন্য শর্করা জাতীয় খাবার, যেমন: চাল/ভাত, আটা/রুটি ও আলু খেতে হবে
- ❖ শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য প্রতিদিন আমিষ জাতীয় খাবার, যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ অথবা ডাল জাতীয় খাবারের যেকোন একটি খেতে হবে
- ❖ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন কিছু পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন: শাক-সবজি ও যে কোন একটি ফল খেতে হবে
- ❖ প্রতিদিনকার খাবারে পরিমাণমত তেল ব্যবহার করতে হবে
- ❖ প্রতিদিন প্রতি বেলায় তিন ধরনের, যেমন: শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধক খাবারের প্রত্যেকটি থেকে কমপক্ষে যে কোন একটি খাবার খেতে হবে

খাদ্য ও পুষ্টি

শর্করা বা শক্তিদায়ক খাবার

আমিষ বা শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণকারী খাবার

স্নেহ জাতীয় বা শক্তিদায়ক খাবার

ভিটামিন সমৃদ্ধ বা রোগ প্রতিরোধক খাবার
(ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'ডি')

খনিজ লবণ সমৃদ্ধ বা রোগ প্রতিরোধক খাবার
আয়রণ, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক

পানি

সুষম খাবার

খাদ্যের ছয়টি উপাদান ব্যক্তি, বয়স, কাজের ধরন ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি রক্ষায় প্রতিদিনের খাবারে যে পরিমাণ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ খাবারকে সুষম খাবার বলা হয়।

সুষম খাবারের ধরন :

- প্রতিদিনের খাবারে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকবে শর্করা জাতীয় খাবার
- শর্করার চেয়ে কিছুটা কম পরিমাণে থাকবে শাক-সবজি
- শাক-সবজির চেয়ে কিছুটা কম এবং পরিমিত পরিমাণে থাকবে আমিষ জাতীয় খাবার
- গরু বা খাসির মাংস, তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার, চিনি ও লবণ সব থেকে কম পরিমাণে খাবেন

মনে রাখতে হবে

- আমাদের প্রতিদিনের খাবার সুষম হওয়া প্রয়োজন
- সুষম খাবার না খেলে শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে ও শিশু সঠিকভাবে বড় হবে না ও বুদ্ধি কম হবে, অধিক পুষ্টিজনিত রোগ বা অপুষ্টিজনিত রোগ, রক্তস্বল্পতা দেখা দিবে
- ০-৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য শুধুমাত্র মায়ের দুধই একমাত্র সুষম খাবার
- ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর জন্য একই রকম ও একই পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন
- কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলাদের পর্যাপ্ত পুষ্টিমান সম্পন্ন সুষম খাবার নিশ্চিত করতে হবে
- বয়স্ক ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পুষ্টিমান সম্পন্ন সুষম খাবার নিশ্চিত করতে হবে
- স্বাস্থ্যকর ও যথার্থ পুষ্টিমানযুক্ত খাবারের জন্য সঠিকভাবে রান্নার পূর্বপ্রস্তুতি, রান্না ও খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে
- রান্নায় পরিমিত আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে
- নিরাপদ খাবার খেতে হবে
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস নিরাপদ পানি পান করতে হবে
- সপ্তাহে ৫দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম অথবা শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে

সুষম খাদ্য

সুষম খাদ্য-১

সুষম খাদ্য-২

সুষম খাদ্য পিরামিড

প্রতিদিনের আহারে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের যথাযথ সমন্বয়ে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে

সমান পুষ্টিমানের দামী ও সস্তা খাবার

পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার মানে কেবল দামী খাবার নয়। ডিম, মাংস, বড় মাছ, ঘি, মাখন ইত্যাদি খাবার দ্বারা আমাদের দেহের যে চাহিদা পূরণ হয়, সেই চাহিদাই আমরা সস্তা দামের চাল, ডাল, ছোট মাছ, শিমের বীচি, বাদাম, সয়াবিন তেল, আলু, গম, শাক-সবজি দ্বারা সহজেই পূরণ করতে পারি।

সমান পুষ্টিমানের সস্তা ও দামী খাবার

ক্রমিক নং	সস্তা খাবার		দামী খাবার
১	মোটা চালের ভাত, মুড়ি, চিড়া, খই, চালের গুড়ার পিঠা, আলু, মিষ্টি আলু, কেশর আলু, আটার রুটি, গুড়, সয়াবিন তেল, ডালডা ইত্যাদি	শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও তেল জাতীয় খাবার)	সরু চালের ভাত, পাউরুটি, পরোটা, চিনি, দুধ/ছানার তৈরি মিষ্টি, কেক, বিস্কুট, মাখন, ঘি ইত্যাদি
২	**ডাল:** মসুর, মুগ, মাষকলাই, মটর, বুট, অড়হড়, খেসারি ইত্যাদি ছোট মাছ, ডিম, শিমের বীচি, মটরশুঁটি, বরবটি, বাদাম, দই, মাঠা ইত্যাদি	শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার (প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাবার)	বড় মাছ, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, খাসির মাংস, কলিজা, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি
৩	**শাক:** লাল শাক, কচু শাক, পালং শাক, পুঁই শাক, ডাটা শাক, কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, লাউ শাক, সরষে শাক, মূলা শাক, পাট শাক, সজনে শাক ইত্যাদি **সবজি:** মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লাউ, পটল, টমেটো, বেগুন, ঝিঙা, চিচিংগা, ধুন্দল, পেঁপে, শশা, কাঁচা কলা, কচুর মুখী, কচুর লতি, করলা, কাকরোল, বরবটি, শিম, ঢেঁড়স, মটরশুঁটি, গাজর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, মূলা, কাঁচামরিচ ইত্যাদি **ফল:** আম, কাঁঠাল, পাকা কলা, তরমুজ, ফুটি, পাকা পেঁপে, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কামরাঙা, জাম্বুরা, কদবেল, বেল, পানিফল, জামরুল, চালতা, বরই, জলপাই, তেঁতুল, ডাব ইত্যাদি **অন্যান্য:** প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত লবণ	রোগ প্রতিরোধক খাবার (ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার)	কমলা, মালটা, আপেল, আঙুর, নাসপাতি, ডালিম ইত্যাদি

মনে রাখতে হবে

- দামি খাবার মানেই পুষ্টিকর খাবার নয়, সস্তা খাবার থেকেও আমরা আমাদের প্রতিদিনকার পুষ্টির চাহিদা মিটাতে পারি
- ছোট মাছ, ডিম, ডাল ও বীচি জাতীয় সস্তা খাবারও আমিষের বেশ ভাল উৎস
- দামে সস্তা বলে শাক-সবজি ও মৌসুমী ফলকে অবহেলা করা ঠিক নয়, এগুলোতেও প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ লবণ আছে

সমান পুষ্টিমানের দামী ও সস্তা খাবার

শক্তিদায়ক

দামী খাবার

সস্তা খাবার

বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক

দামী খাবার

সস্তা খাবার

রোগ প্রতিরোধক

দামী খাবার

সস্তা খাবার

রান্নার পূর্বপ্রস্তুতি ও রান্নায় সতর্কতা অবলম্বন

স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সুষম খাবার খাওয়া যেমন জরুরি তেমনি খাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করে রান্না করাটাও জরুরি। তা নাহলে সুষম খাবার খেলেও খাদ্যের পুরো পুষ্টি আমাদের শরীরে যাবে না এবং আমরা অপুষ্টি জনিত নানা সমস্যায় ভুগতে থাকব। তাই খাবার রান্না করার সময় নীচের কথাগুলো মনে রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে

- খাবার ভালভাবে ঢেকে রাখতে হবে
- বাসি, পঁচা বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার কখনোই খাওয়া যাবে না
- পায়খানার পরে, খাবার রান্নার আগে, খাবার খাওয়ার আগে ও খাবার পরিবেশনের আগে অবশ্যই দুই হাত ভাল করে সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে হবে
- কাঁচা শাক-সবজি বা ফলমূল এবং মাছ-মাংস কাটার আগে আলাদা করে ভালভাবে ধুয়ে নিন
- শাক-সবজি ছোট টুকরা না করে বড় বড় টুকরা করে কাটুন
- অল্প পানিতে শাক-সবজি ঢাকনা দিয়ে অল্প আঁচে সেদ্ধ করুন
- শাক-সবজি, ডাল সর্বদা তেল দিয়ে রান্না করুন
- ভাত রান্নার সময় মাড় ফেলবেন না
- রান্নাঘর অবশ্যই বাড়ির পায়খানা ঘর থেকে দূরে থাকতে হবে
- খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত দা-বটি, হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন ইত্যাদি ঘষেমেজে ধুয়ে নিন এবং রান্নাঘর ও এর আশপাশ সবসময় পরিষ্কার রাখুন
- রান্নার আবর্জনা দূরে মাটিতে গর্ত করে পুতে ফেলুন
- চাল, ডাল,আটা, আয়োডিনযুক্ত লবণ সবসময় শুকনো, মুখবন্ধ, পরিষ্কার কৌটায় শুকনো জায়গায় রাখুন

রান্নার পূর্বপ্রস্তুতি ও রান্নায় সতর্কতা অবলম্বন

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

১২-১৮ বছর বয়সী ছেলে ও মেয়েদের যথাক্রমে কিশোর ও কিশোরী বলা হয়। দেহের সঠিক বেড়ে ওঠার জন্য (সঠিক ওজন ও উচ্চতা), আগের কোন পুষ্টির ঘাটতি থাকলে তা পূরণ ও ভবিষ্যতে নিজেদের স্বাস্থ্যবান মা-বাবা হিসেবে তৈরির জন্য কিশোর-কিশোরীদের সঠিক পুষ্টির প্রয়োজন।

অপুষ্টির দুষ্টচক্র

অপুষ্টিতে আক্রান্ত কিশোর/কিশোরী ➪বিয়ে ➪অপুষ্টিতে আক্রান্ত গর্ভবতী ➪কম জন্ম ওজনের শিশু ➪শিশুটি নানা রকম অসুখে ভুগতে থাকবে ও মেধা বিকাশ কম হবে ➪অপুষ্টিতে আক্রান্ত কিশোর/কিশোরী।

কিশোর-কিশোরীদের কি কি খাদ্য উপাদান বিশেষভাবে প্রয়োজন?

১. বেশি পরিমাণে শক্তিদায়ক খাবার, যেমন: ভাত, রুটি, পরোটা, আলু, চিনি, গুড়, সুজি এবং সয়াবিন তেল, বাদাম, ঘি, মাখন ইত্যাদি।

২. বেশি পরিমাণে শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরক খাবার, যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মটরশুঁটি, শিমের বীচি ইত্যাদি।

৩. বেশি পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন: রঙিন ও সবুজ শাক-সবজি, কলিজা, ডিম, আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার, দুধ ও দুধের তৈরি খাবার এবং সব রকমের দেশী ফল।

৪. মজবুত হাড় গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন: দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, ডিম, কাঁটাসহ মাছ, হাড়সহ মাংস, মাছের তেল ইত্যাদি।

৫. কিশোরী মেয়েদের সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় বেশি পরিমাণে আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন: কলিজা, মাছ, গরু/খাসি/মুরগির মাংস, ডাল, কচুর শাক, কচুর মুখী, লাল শাক, সজনে শাক, কলমী শাক, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখতে হবে

- ❖ অপুষ্টির কারণে কিশোর-কিশোরীরা খাটো হয়, রক্তস্বল্পতা ও বিভিন্ন ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন এ-এর অভাবজনিত রোগ বেশি হয়
- ❖ অপুষ্টির কারণে কিশোরী গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব, অপরিণত প্রসব, কম জন্ম-ওজনের নবজাতক, প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়
- ❖ কিশোরীদের প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরক এবং রোগপ্রতিরোধক খাবারগুলোর প্রত্যেকটি থেকে যে কোন একটি খাবার প্রতিবেলায় খেতে হবে
- ❖ কিশোরীদের প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে
- ❖ ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে হবে
- ❖ নিয়মিত কৃমিনাশক ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে
- ❖ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে প্রতিদিন আয়রণ ক্যাপসুল খাওয়া প্রয়োজন

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি

শক্তিদায়ক খাবার

আমিষ বা ক্ষয়পূরক
এবং শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার

ভিটামিন সমৃদ্ধ বা রোগ প্রতিরোধক খাবার

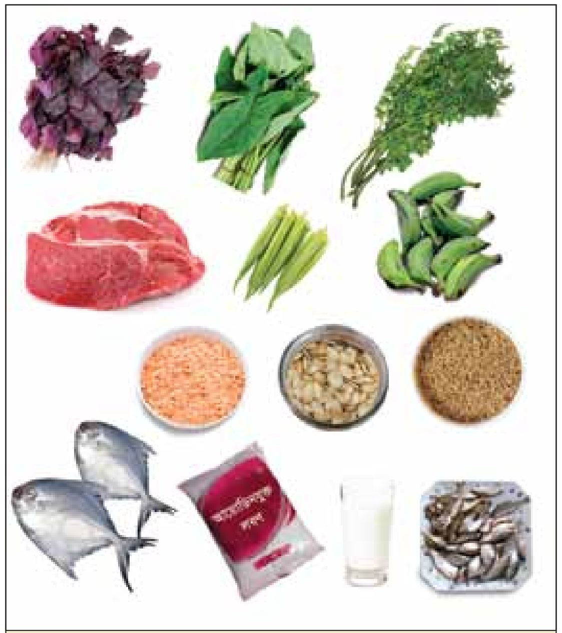

খনিজ লবণ সমৃদ্ধ বা রোগ প্রতিরোধক খাবার
আয়রণ, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক

অপুষ্টির চক্র

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি

গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটলে গর্ভস্থ শিশুটি - কম জন্ম ওজনের হয়, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাহত হয়, নানারকম জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়ের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব ঘটলে মা অপুষ্টিতে ভুগবে, মায়ের দুধ কম হবে ফলে শিশু অপুষ্টিতে ভুগবে।

তাই গর্ভবতী ও মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি নিশ্চিত করতে পরিবারের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে।

মনে রাখতে হবে

- ❖ মায়ের পুষ্টি ঠিক থাকলে একটি সুস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করবে
- ❖ প্রতিদিন তিন ধরনের খাবারের তালিকা থেকেই কিছু কিছু খাবার নিয়ে সুষম খাদ্য খেতে হবে
- ❖ আমিষ, ভিটামিন 'এ', আয়রণ, ফলিক এসিড, ভিটামিন 'সি' ও আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে
- ❖ গর্ভবতী মা প্রতিবেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একমুঠো খাবার বেশি খাবেন
- ❖ প্রসূতি মায়ের গর্ভাবস্থার থেকেও বেশি খাবার খেতে হবে, তিনি প্রতিবেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে দুই মুঠো খাবার বেশি খাবেন
- ❖ পরিবারের সবাইকে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে
- ❖ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মাকে বেশি করে পানি খেতে হবে (সারাদিনে কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস)
- ❖ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রণ, ফলিক এসিড ও ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট/ক্যাপসুল খাবেন
- ❖ মাতৃদুগ্ধদানকারী মা প্রসবের পরপরই (৪২ দিনের মধ্যে) ১টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাবেন
- ❖ আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি

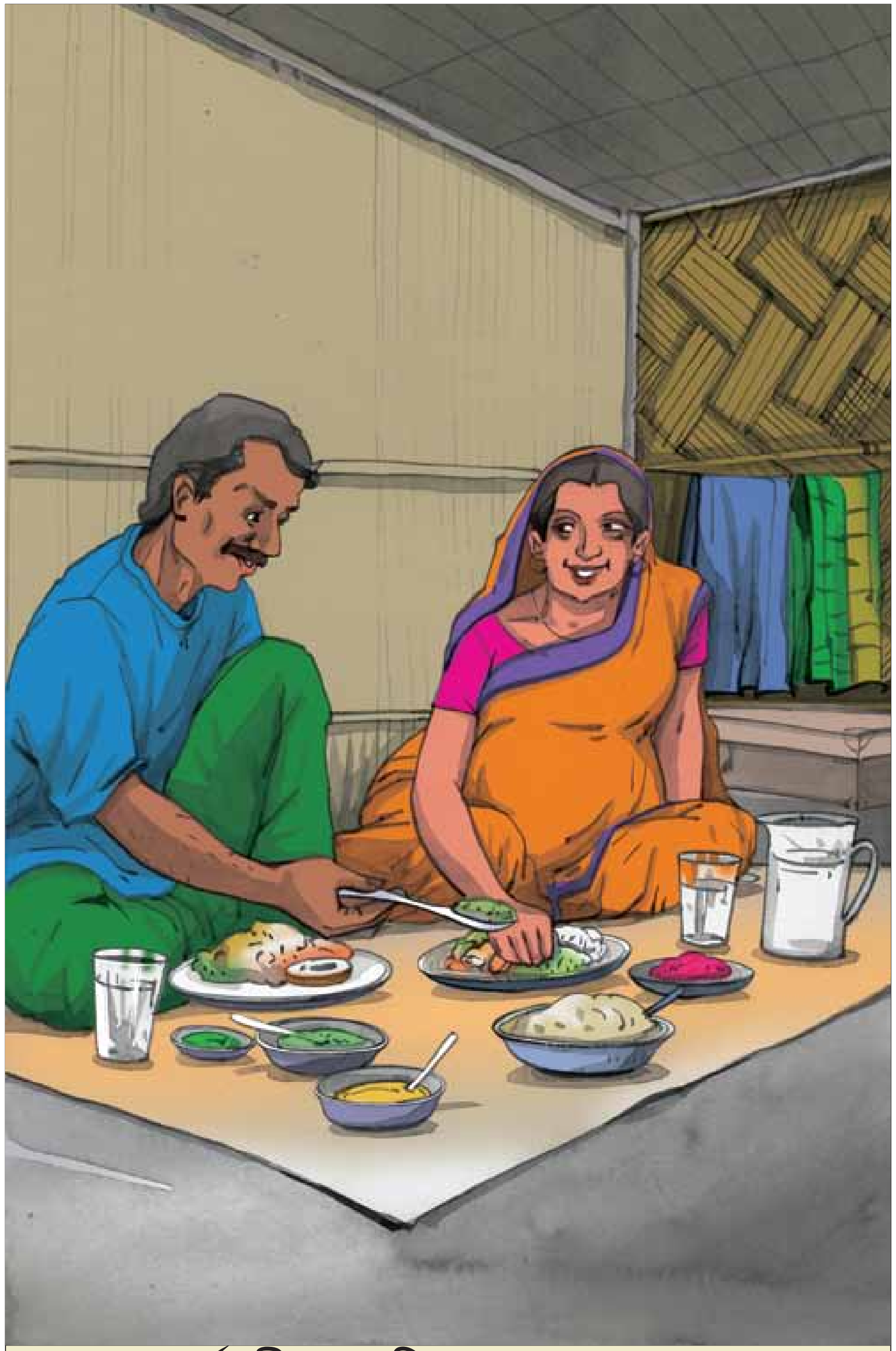

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সুষম খাবার

শক্তিদায়ক খাবার

শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার

রোগ প্রতিরোধক খাবার

গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যা

গর্ভবতী মহিলার জন্য উপযুক্ত যথেষ্ট খাবার নিশ্চিত করা যেমন জরুরি তেমনি বিশ্রাম নিশ্চিত করার দায়িত্বও পরিবারের সবার।

গর্ভাবস্থায় যা করা যাবে না

- গর্ভাবস্থায় ভারী কাজ যেমন- টিউবওয়েল চাপা, ধান ভানা, কলসী বা বালতিতে পানি আনা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজ করা যাবে না।

গর্ভাবস্থায় যা করতে হবে

- গর্ভবতীকে প্রতিদিন রাতে ৮ ঘন্টা ঘুমাতে হবে এবং দিনে কমপক্ষে ২ ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন গোসল করতে হবে ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাকে প্রতিমাসে একবার ওজন নিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এতে গর্ভবতী জানতে পারবেন তার শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা ও শিশুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তার কোন ধরনের যত্নের প্রয়োজন।
- গর্ভবতী মহিলা শারীরিক পরীক্ষার জন্য কমপক্ষে চারবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবেন।
- পরিবারের সবাইকে গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন বিপদচিহ্ন জানতে হবে। বিপদচিহ্ন দেখা দিলে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হবে অথবা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী দিয়ে প্রসব করাতে হবে।
- গর্ভকালীন ও প্রসবের সময় জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য পরিবারের সকলকে আগে থেকে তৈরি থাকতে হবে।

গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন বিপদচিহ্ন

১. **রক্তস্রাব** - গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব, প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে খুব বেশি রক্তস্রাব, গর্ভফুল না পড়া।

২. **তীব্র মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, হাতে পায়ে পানি আসা** - গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে তীব্র মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, হাতে পায়ে পানি আসা।

৩. **ভীষণ জ্বর** - গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পরে তিন দিনের বেশি জ্বর ও দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

৪. **বিলম্বিত প্রসব** - ১২ ঘন্টার বেশি প্রসব ব্যথা থাকা, প্রসবের সময় বাচ্চার মাথা ছাড়া অন্য অঙ্গ আগে বের হওয়া।

৫. **খিঁচুনি** - গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে খিঁচুনি।

গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যা

গর্ভবতীর পরিচর্যা

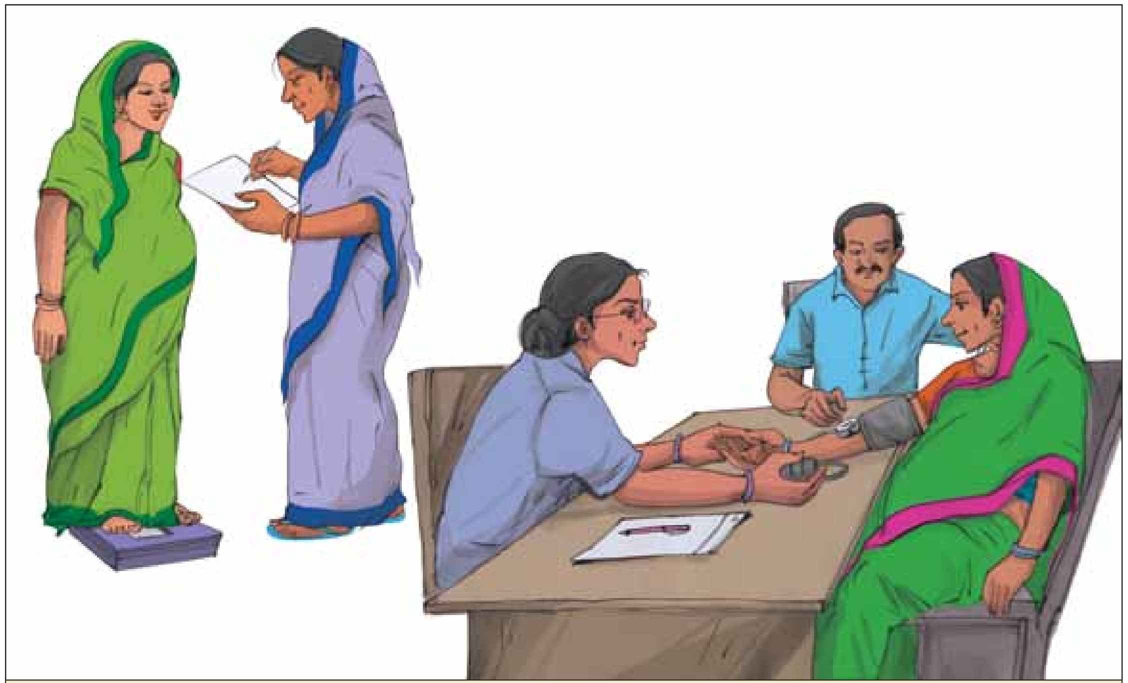

গর্ভবতীর ওজন ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরামর্শ গ্রহণ

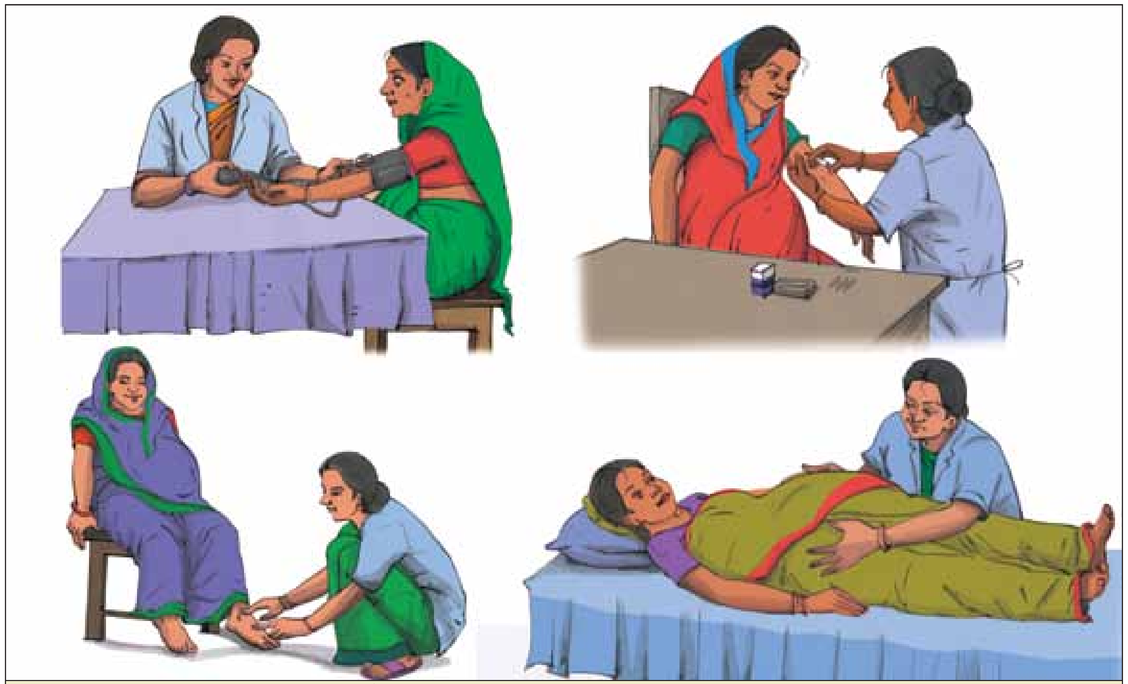

গর্ভবতীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চেকআপ

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী বিপদচিহ্ন

নবজাতকের পরিচর্যা

জন্মের পর থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলে। প্রতিবছর ২৬ লাখ শিশু জন্মের প্রথম সপ্তাহেই মারা যায়। মায়ের ও নবজাতকের সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে এইসব মৃত্যু রোধ করা সম্ভব।

নবজাতকের বিপদচিহ্ন

১. হঠাৎ মায়ের দুধ টেনে খেতে না পারা।

২. নিস্তেজ হয়ে যাওয়া

৩. অনেক জ্বর বা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া

৪. খিঁচুনি

৫. দ্রুত শ্বাস বা শ্বাসের সময় বুক ডেবে যাওয়া

৬. নাভি পাকা বা চোখ হতে পুঁজ পড়া

৭. গায়ে অনেক ফুসকুড়ি হওয়া

৮. পেট ফুলে যাওয়া ও অনবরত বমি হওয়া

৯. ১৪ দিনের বেশি জন্ডিস থাকা।

মনে রাখতে হবে

- জন্মের পরপর শিশুকে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ভাল করে মুছে মাথাসহ সমস্ত শরীর ঢেকে রাখুন
- জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে শিশুকে শালদুধ খাওয়াতে হবে এবং ছয় মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ান
- নাভিতে কোন কিছু লাগাবেন না
- ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করুন
- ৩ দিনের আগে গোসল করাবেন না ও ১ মাসের আগে চুল ফেলবেন না
- ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে শিশুকে টিকা দিতে শুরু করুন
- বিপদচিহ্ন দেখা দিলে সাথে সাথে শিশুকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যান

নবজাতকের পরিচর্যা

নবজাতকের যত্ন

নবজাতকের বিপদ চিহ্ন

নবজাতকের এইসব বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান

নবজাতকের পুষ্টি

শিশুর জন্য মায়ের দুধই সেরা। শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির সবটুকুই মায়ের দুধে থাকে। প্রসবের পরে প্রথমে হালকা হলুদ রঙের যে দুধ আসে সেটাই শালদুধ। নবজাতক শিশুর জন্য শাল দুধ খুবই জরুরি। শালদুধ খাওয়ালে শিশু নানারকম রোগের (নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি) হাত থেকে রক্ষা পায়। শিশুর মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধ খুবই প্রয়োজনীয়।

মনে রাখতে হবে

- জন্মের সাথে সাথে (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে ও শালদুধ খাওয়াতে হবে। শালদুধ শিশুর প্রথম টিকা হিসাবে কাজ করে
- জন্মের পরে শিশুর মুখে মধু, চিনির পানি, সরিষার তেল, মিছরির পানি বা বাইরের তরল বা অন্য কোনো খাবার জিনিস একেবারেই দেয়া যাবে না
- মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় মা ও শিশুর অবস্থান (পজিশন) ও শিশুর মুখ স্তনে ঠিকভাবে লাগানো (অ্যাটাচমেন্ট) এবং প্রয়োজনে যথাযথভাবে দুধ গেলে খাওয়ানো প্রয়োজন
- বুকের দুধ খাওয়ানো মা ও শিশুর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়
- শিশুকে ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত বাড়তি খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে
- বুকের দুধ শিশুর জন্য নিরাপদ ও সঠিক খাবার। এটি শিশুকে পর্যাপ্ত পুষ্টি যোগায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিত করে
- জন্মের পর থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে অন্য কোন কিছু খাওয়ানো যাবে না এমনকি একফোঁটা পানিও না
- ৬ মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত দিনে কমপক্ষে ৮ বার ও রাতে কমপক্ষে ৩ বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে
- জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ালে শিশুর ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়
- শিশুকে বোতলে দুধ খাওয়াবেন না। এত শিশুর পেটের অসুখসহ বিভিন্ন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে
- দুধের পরিমাণ বাড়াতে ঘনঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, শিশু যতই মায়ের বুকের দুধ খেয়ে খালি করবে মায়ের বুকে তত বেশি দুধ আসবে
- শিশুর দুধ খাওয়া শেষ হলে শিশুকে শুঁইয়ে দিবেন না। কাঁধের উপর তুলে নিয়ে শিশুর পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে ঢেকুর তোলাতে হবে

নবজাতকের পুষ্টি

মায়ের বুকে শিশুর সঠিক অবস্থান (পজিশন)

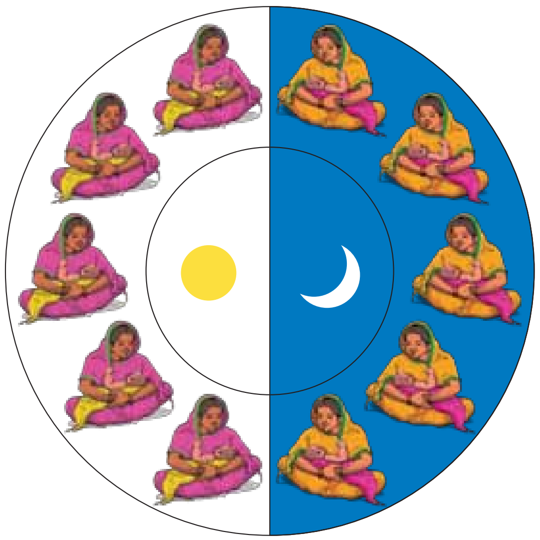

দিনে ৫ বার ও রাতে ৩ বার বুকের দুধ খাওয়ান

কোনটাই না

বয়স অনুযায়ী শিশুর পুষ্টি

ছয় মাস বা ১৮০ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টির সবটুকুই মায়ের দুধে থাকে। ছয় মাস বয়সের পর অর্থাৎ ১৮১ দিন থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দিতে হবে কারণ এই সময় শিশুর মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধি হয়।

মনে রাখতে হবে

- গর্ভাবস্থা থেকে জন্মের প্রথম দু'বছরে অপর্যাপ্ত পুষ্টি সারাজীবনের জন্য শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেতে পারে।
- শিশুর সুস্বাস্থ্য ও সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন সুষম খাবার, যার মধ্যে থাকবে শর্করা, আমিষ, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ বিশেষত ভিটামিন 'এ' ও আয়রণ
- শিশুর খাবারে যাতে কমপক্ষে চার ধরনের খাবার, যেমন: ভাত, ঘনডাল, সবুজ বা রঙিন শাক/হলুদ সবজি এবং দিনে একবার একটি প্রাণীজ খাবার (মাছ/ডিম/মুরগির কলিজা/মাংস) থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে
- শিশুর খাবার রান্নার সময় পরিমাণমত তেল মেশাতে হবে (মাঝারি ২ চামচ)
- ০-৬ মাস বয়সী শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- ৬ মাস বয়সের পর অর্থাৎ ১৮১ দিন থেকে শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি পুষ্টিকর বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হবে
- বয়স অনুযায়ী শিশুর প্রতিদিনের বাড়তি খাবারের পরিমাণ:

বয়স	পরিমাণ	কতবার	দিনের মোট খাবার
৬ - ৮ মাস	১ পোয়া বাটির আধা (১/২) বাটি	২ বার	১ পোয়া বাটির এক (১) বাটি
৯ -১১ মাস	১ পোয়া বাটির আধা (১/২) বাটি	৩ বার + ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা	১ পোয়া বাটির দেড় (১.৫) বাটি + ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা
১২-২৩ মাস	১ পোয়া বাটির এক (১) বাটি	৩ বার + ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা	১ পোয়া বাটির তিন (৩) বাটি + ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা

- ২ বছর বয়সের পর থেকে শিশুকে পরিবারের অন্যরা যে খাবার খায় (সুষম খাবার) তাই তিন বেলা ও পুষ্টিকর নাস্তা দুই বেলা খেতে দিন
- নাস্তা হিসেবে শিশুকে পাকা আম, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, পাকা কলা, বিভিন্ন মৌসুমী ফল, সিদ্ধ ডিম, দুধের তৈরি খাবার, তেলে ভাজা খাবার ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে
- শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী খাবারের ঘনত্ব বাড়াতে হবে
- শিশুর খাবার তৈরির পূর্বে ও শিশুকে খাওয়ানোর আগে শিশুর যত্নকারীদের অবশ্যই সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ভালভাবে ধুতে হবে।
- শিশু নিজে নিজে খেলে খাওয়ার পূর্বে শিশুর দুই হাত অবশ্যই সাবান ও পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে দিতে হবে
- শিশুর মন মেজাজ বুঝে তাকে খাওয়াতে হবে, শিশুকে জোর করে খাওয়ানো যাবে না
- শিশুর অসুস্থতার সময় আধা শক্ত এবং শক্ত খাবার খাওয়ানো কমিয়ে দেয়া উচিত নয়, এই সময় ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে যাতে সে বেশি দুধ পায়। শিশু সুস্থ হওয়ার পর ৭-১০ দিন পর্যন্ত এক বেলা বেশি বাড়তি খাবার দিতে হবে

বয়স অনুযায়ী শিশুর পুষ্টি

বয়স অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ

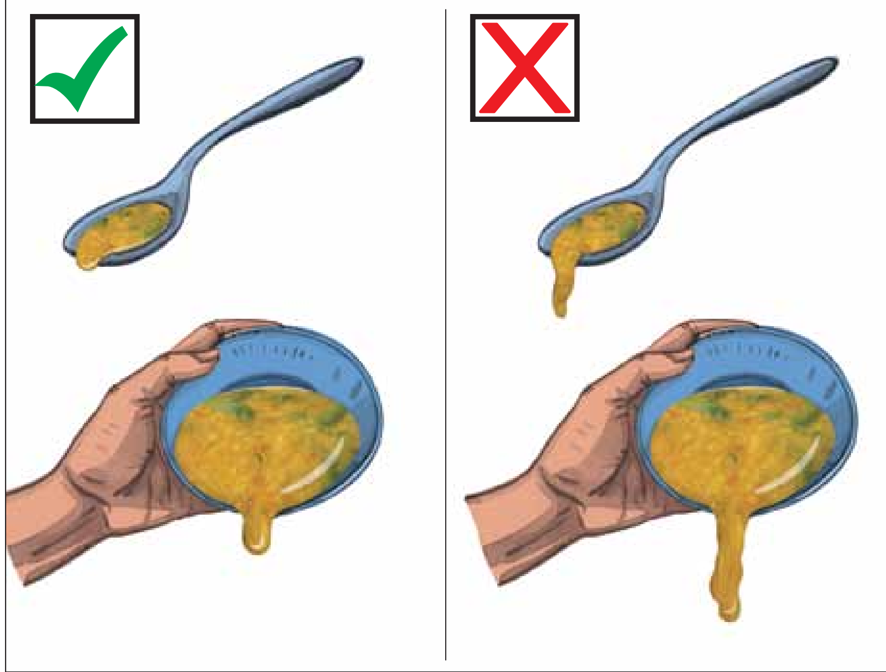

খাবারের ঘনত্ব

খাবার তৈরি, খাবার খাওয়ানোর আগে
সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া

শিশুর সঠিক বৃদ্ধি

শিশু সুস্থ আছে কিনা, তার খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, সে ঠিকমত পুষ্টি পাচ্ছে কিনা জানার জন্য দুই বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার করে শিশুর ওজন মাপা প্রয়োজন। পরপর দুই মাস ওজন না বাড়লে স্বাস্থ্যকর্মীকে জানাতে হবে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে

- গর্ভকালীন সময়ে মায়ের এবং জন্মের পর প্রথম দুই বছরে শিশুর পুষ্টির অভাব হলে একজন শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধি ও মানসিক বিকাশ সারা জীবনের জন্য ব্যাহত হতে পারে
- জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাদ্য ও পানীয়
- ছয় মাস বয়সের পর থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার শিশুকে খাওয়াতে হবে
- শিশু জন্মের মুহূর্ত থেকে শিখতে শুরু করে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ সবচেয়ে ভাল হয় যখন সে যথাযথ পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি যত্ন, ভালবাসা এবং উৎসাহ পায়
- শিশুর জন্মের পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম ওজন মাপতে হবে যা শিশুর জন্ম ওজন
- জন্মের পর থেকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার ওজন মাপতে হবে
- প্রতিবার ওজন মাপার পর শিশুর ‘বৃদ্ধি চার্ট’/‘Growth Chart’ এ ওজন নির্দেশ করতে হবে
- যদি দেখা যায় যে শিশুর ওজন বাড়ছে না অথবা ওজন কমে যাচ্ছে, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে

শিশুর সঠিক বৃদ্ধি

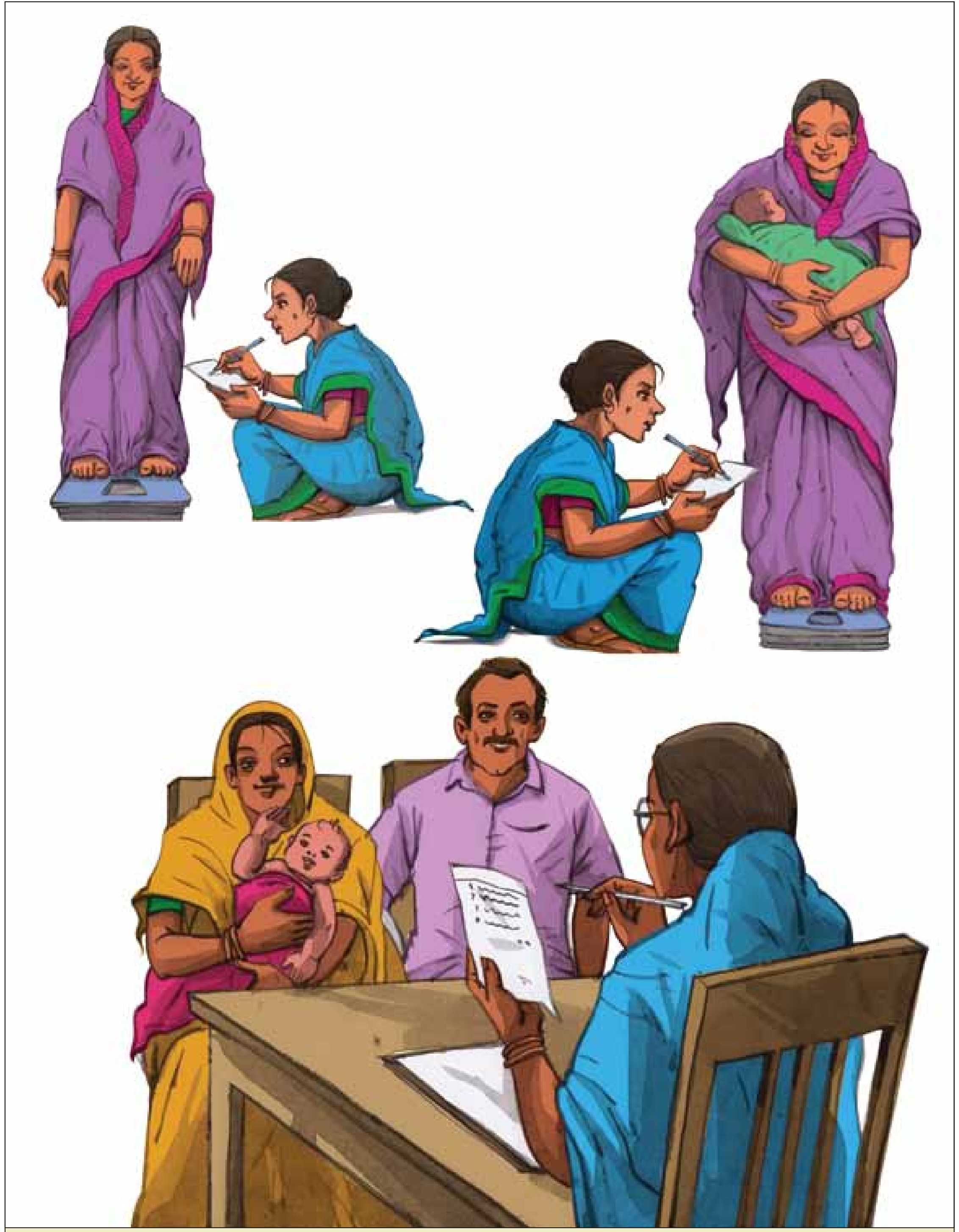

প্রতি মাসে শিশুর ওজন মাপতে হবে

ওজন বৃদ্ধির চার্ট

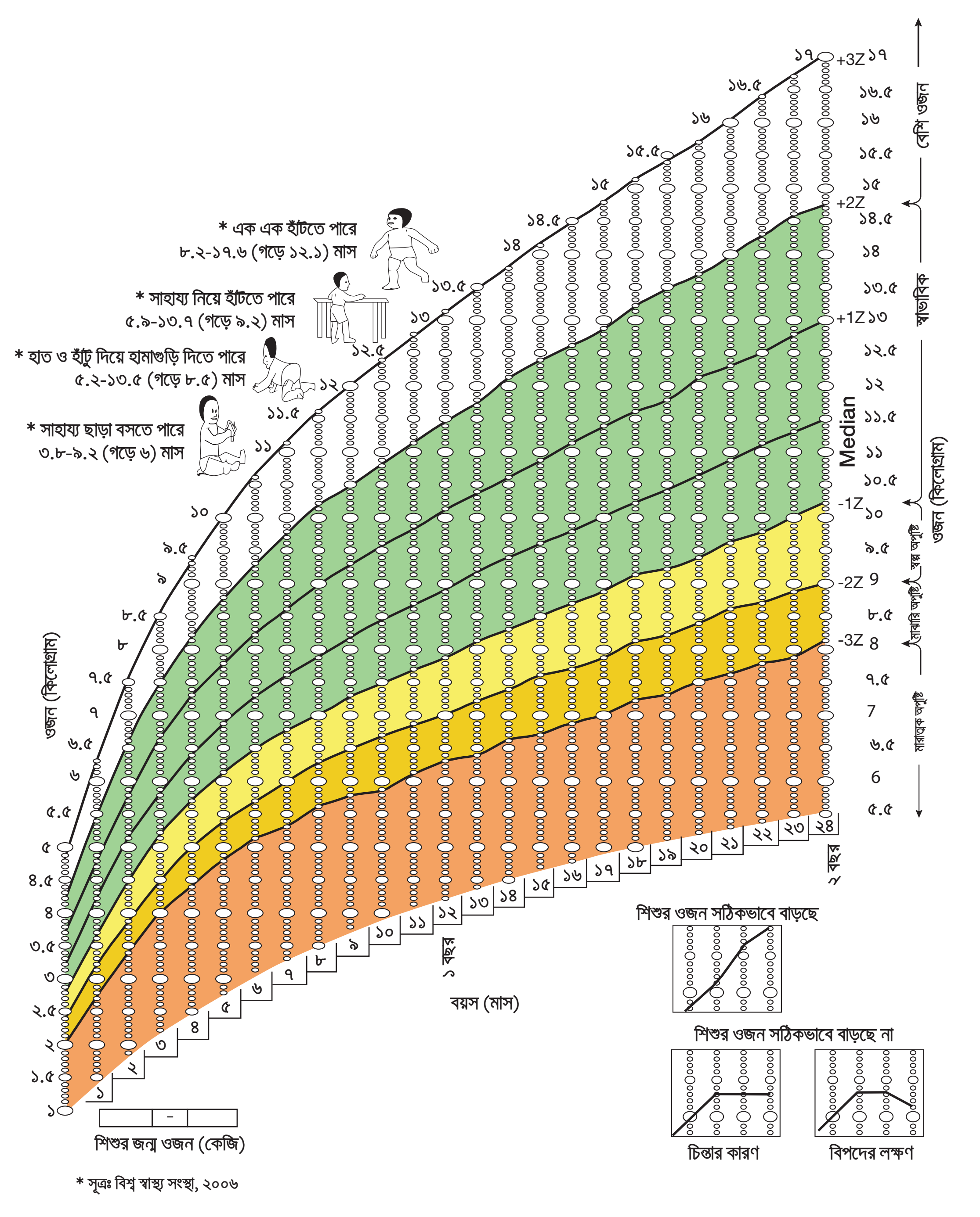

মেয়েদের ওজন বৃদ্ধির চার্ট

শিশুর অপুষ্টি ঃ ধরন, কারণ ও প্রতিকার

অপুষ্টি বলতে অতিপুষ্টি (মেদস্থুলতা) এবং পুষ্টি ঘাটতি দু'টোই বোঝায়। কিন্তু সাধারণভাবে অপুষ্টি বলতে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

অপুষ্টির কারণ

- অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ (পরিমাণগত ও গুণগত মানের দিক থেকে)
- অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, অসুখ ও যত্নের অভাব
- অসুখ-বিসুখ
- যত্নের অভাব

অপুষ্টির প্রকারভেদ

- ওয়াসটিং/ক্ষীণকায়: অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন বা তীব্র অপুষ্টি (দুই পায়ে পানি আসা অথবা বাহুর মধ্যভাগের পরিধির পরিমাপ (মুয়াক) কমে যাওয়া বা উচ্চতা অনুপাতে ওজন কম হওয়া
- স্টানটিং/খর্বাকৃতি/বেঁটে: বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম হওয়া।
- আন্ডারওয়েট/কম ওজন: বয়স অনুপাতে ওজন কম হওয়া
- অনুপুষ্টির অভাব: আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ, আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ ইত্যাদি

মনে রাখতে হবে

- ০-৬ মাস বয়সী শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে এবং শিমুর বয়স ২ বছর হওয়া পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে
- অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে প্রতিদিন আমিষযুক্ত খাবার, যেমন: মাছ/মাংস/ডিম/ডাল খাওয়াতে হবে। সেইসাথে প্রতিদিন শাক-সবজি ও ফলমূল খাওয়াতে হবে
- নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে ও নিরাপদ পানি পান করতে হবে
- মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে অবশ্যই দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে
- সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে এসব রোগে শিশুর মৃত্যু হতে পারে

শিশুর অপুষ্টি ঃ ধরন, কারণ ও প্রতিকার

বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক উচ্চতা — **৩ বছর বয়সী শিশু**

স্বাভাবিক শিশু

উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম (ওয়াসটিং/ক্ষীণকায়)

বয়স অনুপাতে উচ্চতা কম (স্টানটিং/খর্বাকৃতি)

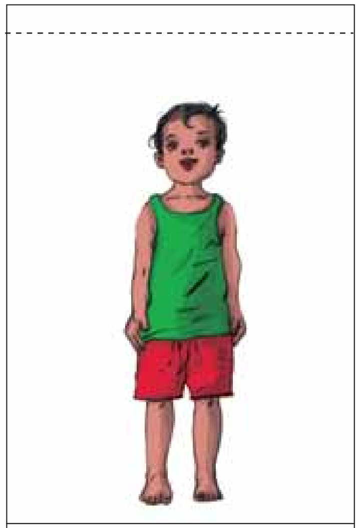
বয়স অনুপাতে ওজন কম (আন্ডার ওয়েট/স্বল্প ওজন)

শক্তি ও আমিষের অভাবজনিত অপুষ্টি

অণুপুষ্টির অভাবজনিত অপুষ্টি

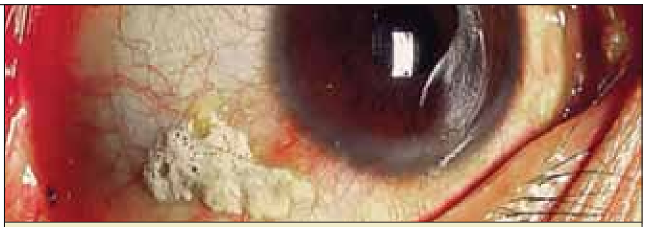
ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা

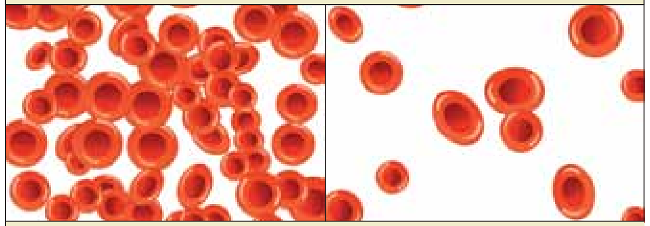
আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা

আয়োডিনের অভাবজনিত গলগণ্ড

শক্তিদায়ক খাবার

শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরক খাবার

রোগ প্রতিরোধক খাবার

শিশুর হাড্ডিসার ও গা-ফোলা রোগ

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির কারণে শিশুদের প্রধানত দুই ধরনের রোগ হয়:

১। হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস

২। গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিজনিত হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস :

শিশুদের প্রতিদিনকার খাবারে শক্তি ও আমিষ জাতীয় খাবারের ঘাটতি থাকলে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি জনিত হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস রোগ হয়। এ ধরনের শিশুদের শরীরের চর্বি ও মাংসপেশী শুকিয়ে যায় ও সমবয়সী সুস্থ একটি শিশুর থেকে ওজন অনেক কমে যায়।

লক্ষণ :

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (ম্যারাসমাস) তে আক্রান্ত একটি শিশুর মধ্যে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যাবে

- রোগা পাতলা শরীর, দেখে মনে হবে বুড়ো হয়ে গেছে
- শিশুটি একেবারে চুপচাপ, দুর্বল এমনকি কান্না করার শক্তিও থাকবে না
- বুকের পাজরের হাড় ও অন্যান্য হাড় সহজেই চোখে পড়বে
- চামড়াগুলো ঝুলে পড়বে
- পেছন থেকে ঘাড় ও পাজরের হাড় স্পষ্ট চোখে পড়ে
- মারাত্মক ওজন কমে গেলে মনে হবে পুরো শরীর থেকে চামড়া ঝুলে পড়েছে

প্রতিরোধ :

- ৬ মাস বয়সের পর থেকে প্রতিদিন শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত শক্তি, প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি, শস্য জাতীয় খাবার এবং আমিষযুক্ত খাবার দিতে হবে
- শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ সঠিকভাবে পরিমাণমত খাওয়াতে হবে

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিজনিত গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর :

শিশুদের প্রতিদিনকার খাবারে আমিষ জাতীয় খাবারের ঘাটতি থাকলে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিজনিত গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। এ ধরনের শিশুদের দুই পায়ের পাতায়, দুই পায়ে ও দুই হাতে অথবা মুখসহ সারা শরীরে পানি জমে।

লক্ষণ :

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি (কোয়াশিয়রকর) তে আক্রান্ত একটি শিশুর মধ্যে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যাবে

- চাঁদের মত গোল মুখ
- চামড়ায় সাদা-কালো ছোপ ছোপ দাগ, দগদগে ঘা (মারাত্মক ক্ষেত্রে)
- দুর্বল, উদাসীন
- খাওয়ার রুচি নষ্ট হওয়া
- চুলের রং পরিবর্তন
- খুব সহজেই বিরক্ত হয়, সারাক্ষণ কান্না করে

প্রতিরোধ :

- প্রতিদিন শিশুকে তার বয়স অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের আমিষ যুক্ত সুষম খাবার, যেমন: মাছ, ডিম, মুরগির মাংস, গরুর মাংস দিতে হবে। সেইসাথে অন্যান্য খাবার দিতে হবে।
- শিশুকে দুই বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ সঠিকভাবে পরিমাণমত খাওয়াতে হবে

* ম্যারাসমাস বা কোয়াশিয়রকরে আক্রান্ত শিশুদের অবশ্যই দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে
* সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে এসব রোগে শিশুর মৃত্যু হতে পারে

শিশুর হাড্ডিসার ও গা-ফোলা রোগ

হাড্ডিসার বা ম্যারাসমাস

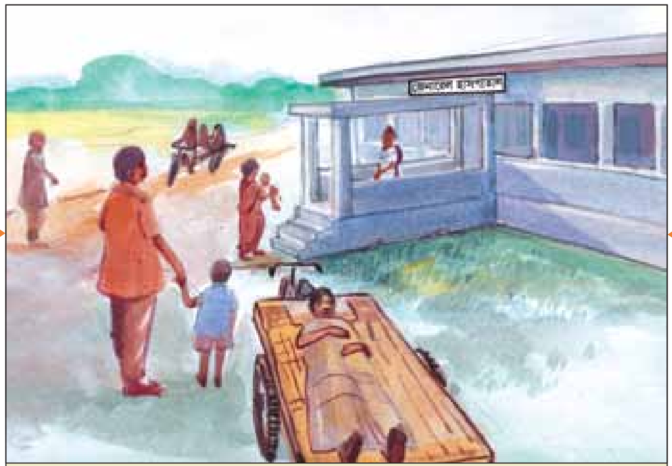

হাসপাতাল

গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর

শক্তিদায়ক খাবার

বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরক খাবার

রোগ প্রতিরোধক খাবার

আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা

অনেক দিন থেকে খাবারে আয়রণ/লোহার অভাব হলে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে, কৃমিরোগে আক্রান্ত হলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। শিশুদের, গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলা এবং কিশোরীদের রক্তস্বল্পতা বেশি দেখা যায়। আয়রণ রক্তের লাল অংশ (হিমোগ্লোবিন) গঠনে সহায়তা করে।

আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার

১. প্রাণীজ উৎস: বড় মাছ, ছোট মাছ, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, কলিজা

২. উদ্ভিজ উৎস: কচু শাক, লাল শাক, সজনে শাক, কলমি শাক, পাকা কলা, কাঁচা কলা, কিশমিশ, শিম, মটরশুঁটি

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার: লেবু, কমলা, মোসাম্বি, জাম্বুরা, আমলকি, কামরাঙা, আমড়া, পেয়ারা, কাঁচামরিচ

মনে রাখতে হবে

- রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে দুর্বলতা ও ক্লান্ত বোধ হয়, বুকে ব্যথা বা বুক ধড়ফড় করে এবং খুব সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়
- গর্ভকালীন সময়ে রক্তস্বল্পতা থাকলে -অপরিণত শিশুর জন্ম, কম জন্ম ওজনের শিশুর জন্ম, শিশু ও মায়ের মৃত্যুর সম্ভাবনা বৃদ্ধি ইত্যাদি হতে পারে
- রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রণ, ফলিক এসিড ও ভিটামিন 'বি১২' এবং ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের প্রতিদিন একটি করে আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট রাতে খাওয়ার সাথে খেতে হবে
- কিশোরীদের সপ্তাহে দু'টি করে আয়রণ-ফলিক এসিড ট্যাবলেট রাতে খাওয়ার সাথে খেতে হবে
- যেসব শাক-সবজি, ফল মূল কাটার কিছু সময় পর কালো হয়ে যায় তাতেই আয়রণ আছে
- আয়রণসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার পর কখনওই ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার, যেমন: দুধ বা চা খাওয়া যাবেনা। খেলে আয়রণের কার্যকারীতা অনেক কমে যবে
- ভিটামিন সি আয়রণের শোষণক্ষমতা বাড়ায়, তাই প্রতিবেলার খাবারের সাথে এক টুকরা লেবু খান
- নিয়মিত কৃমিনাশক ট্যাবলেট সেবন করতে হবে
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে হবে

আয়রণের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা

আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে

ভিটামিন 'সি', ফলিক এসিড ও ভিটামিন 'বি১২' সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে

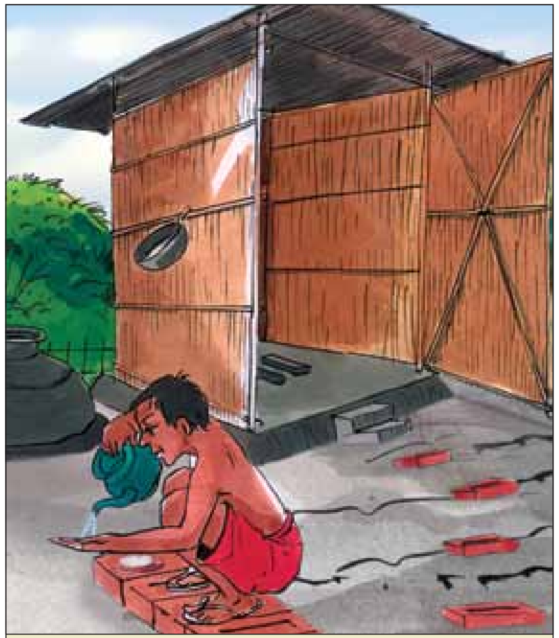

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে ও স্যান্ডাল পায়ে চলাচল করতে হবে

পায়খানা ব্যবহারের পর ও খাবার ধরার আগে সাবান দিয়ে দুই হাত ধুতে হবে

গর্ভবতী ও প্রসূতি মা প্রতিদিন একটি আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাবে

কিশোরী সপ্তাহে দু'টি আয়রণ ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাবে

ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ

শরীরে ভিটামিন ‘এ’-র অভাব হলে রাতকানা রোগ হয়। রাতকানা রোগ হলে শিশু কম আলোতে বা রাতে কম বা ঝাপসা দেখে। সময়মত চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাতকানা রোগ প্রতিরোধে

- শিশুকে জন্মের পর পরই শালদুধসহ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- ৬ মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে এবং ২ বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে
- ৯ মাস বয়সের শিশুদের হামের টিকার সাথে একটি নীল রং-এর (১ লক্ষ অই ইউ) ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
- ৬ -৫৯ মাস বয়সী শিশুকে প্রতি ৬ মাস পর পর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে
- শিশুর জন্মের ৬ সপ্তাহের মধ্যে মা’কে একটি (২ লক্ষ অই ইউ) ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে

ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার

১. মায়ের বুকের দুধ

২. গাঢ় সবুজ ও রঙিন শাক, যেমন: কচু শাক, সজনে শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালংশাক, কলমি শাক, ডাঁটা শাক ইত্যাদি

৩. রঙিন সবজি, যেমন: গাজর, মিষ্টি কুমড়া, বিট, মিষ্টি আলু ইত্যাদি

৪. হলুদ ও লাল কমলা ফলমূল, যেমন: পাকা আম, পাকা কাঁঠাল, পাকা পেঁপে ইত্যাদি

৫. ডিমের কুসুম, কলিজা, ছোট মাছ যেমন: মলা মাছ, ঢেলা মাছ ইত্যাদি

৬. দুধ ও দুধ দিয়ে তৈরি খাবার

৭. বোতলজাত রান্নার ভোজ্য তেল

৮. ভিটামিন ‘এ’ শরীরে কাজে লাগার জন্য শাক-সবজি পরিমিত তেল দিয়ে রান্না করতে হবে

ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগ

ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার

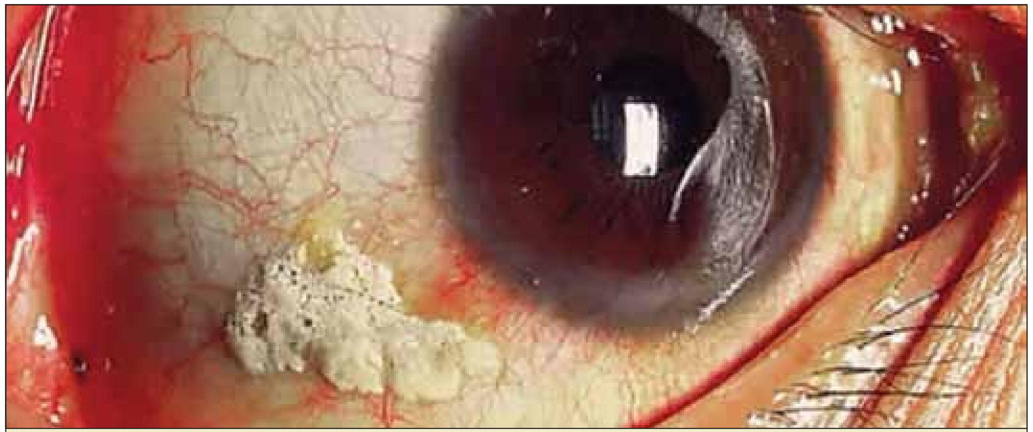

রাতকানা রোগে আক্রান্ত চোখ

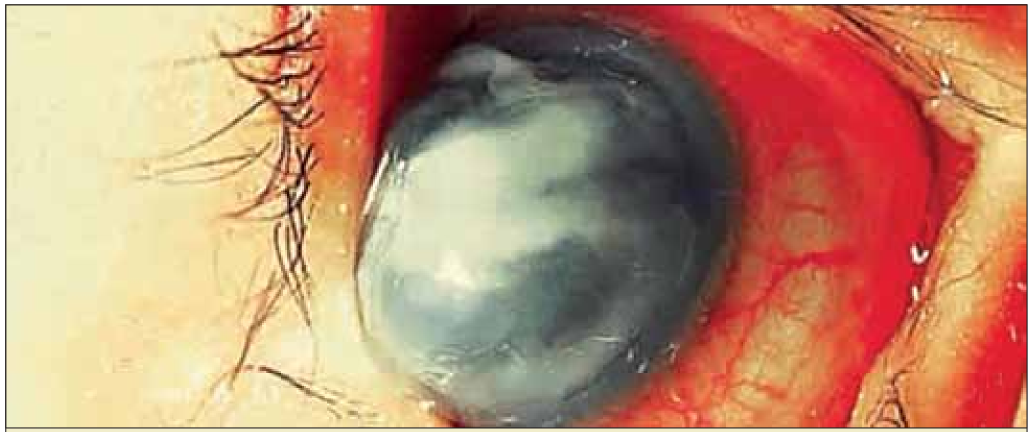

রাতকানা রোগের চিকিৎসা না হলে শিশু অন্ধ হয়ে যায়

শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়াতে হবে

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আয়োডিন প্রয়োজন। শরীরে আয়োডিনের অভাব হলে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ, মানসিক প্রতিবন্ধী বা হাবা-গোবা, কালা, বোবা, বামন ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে। মহিলাদের আয়োডিনের অভাব হলে মৃত সন্তান প্রসব, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ, হাবা-গোবা, কালা, ট্যারা, বামন সন্তান জন্মাতে পারে।

আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের উপায়

আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন :

১. সামুদ্রিক মাছ
২. আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া

মনে রাখতে হবে

- আয়োডিনযুক্ত লবণ আদ্রতারোধক ব্যাগে সীল করে রাখতে হবে
- ঘরে রাখতে হলে কৌটায় মুখ বন্ধ করে চুলার পাশ থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন
- বাজারের খোলা লবণ না খেয়ে প্যাকেটজাত আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া ভাল
- আয়োডিনের অভাবজনিত লক্ষণগুলো দ্রুত শনাক্ত করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা নিতে হবে
- প্রতিদিন আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে
- আয়োডিনযুক্ত লবণ জলীয় বাষ্প, সূর্যরশ্মি ও উচ্চ তাপমাত্রা থেকে দূরে রাখা উচিত
- লবণে আয়োডিন মেশানোর এক বৎসরের মধ্যে তা ব্যবহার করে ফেলা দরকার

আয়োডিনের অভাবজনিত সমস্যা

গলগণ্ড

আয়োডিনের উৎস

একই বয়সের দুই বালিকার দৈহিক বৃদ্ধির পার্থক্য

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী

বিকলাঙ্গ শিশু

ভিটামিন ‘সি’ ও ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবজনিত রোগ

ভিটামিন ‘সি’

ভিটামিন ‘সি’ এর অভাবে ‘স্কার্ভি’ রোগ হয়। এই রোগে মাড়ি ফুলে যায় ও মাড়ি থেকে সহজে রক্ত পড়ে। আয়রণসমৃদ্ধ খাবারের পরে ভিটামিন ‘সি’সমৃদ্ধ খাবার খেলে তা রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

মনে রাখতে হবে

- ভিটামিন ‘সি’ তাপে নষ্ট হয়, তাই ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবারসমূহ কাঁচা খেতে হবে
- ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবারসমূহ অনেকক্ষণ আগে কেটে না রেখে খাওয়ার আগে কাটা উচিৎ
- সর্দি-কাশিতে ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত
- ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবার খেলে কাটা ক্ষত তাড়াতাড়ি ভাল হয়

ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবার

লেবু জাতীয় সকল ফল, যেমন: লেবু, কমলা, মোসাম্বি, জাম্বুরা, বাতাবীলেবু, টক ফল, যেমন: আমলকি, কামরাঙা, আমড়া, পেয়ারা, কাঁচা মরিচ (সবুজ ও লাল)

তাজা সবজি, যেমন: বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক, টমেটো।

ভিটামিন ‘ডি’

ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে শিশুদের রিকেটস ও বড়রা হাড়ের নানারকম সমস্যা হয়

মনে রাখতে হবে

- সূর্যের আলো ভিটামিন ডি-এর সবচেয়ে বড় উৎস
- শিশুদের শরীরে প্রতিদিন ১০-৩০ মিনিট সূর্যের আলো লাগানো উচিত
- গর্ভবতী মহিলাদেরও গায়ে সূর্যের আলো লাগার সুযোগ করে দিতে হবে
- রিকেটস হলে শিশু চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেতে পারে

ভিটামিন ‘ডি’ কোথায় পাওয়া যায়

- সূর্যের আলো আমাদের ত্বকের কোষে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি করে, এটিই সবচেয়ে বড় উৎস
- এছাড়া ডিমের কুসুম, দুধ, মাছের তেলে ভিটামিন ‘ডি’ পাওয়া যায়

ভিটামিন ‘সি’ ও ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবজনিত রোগ

স্কার্ভি রোগে মাড়ি হতে রক্ত পড়ছে

ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ খাবার

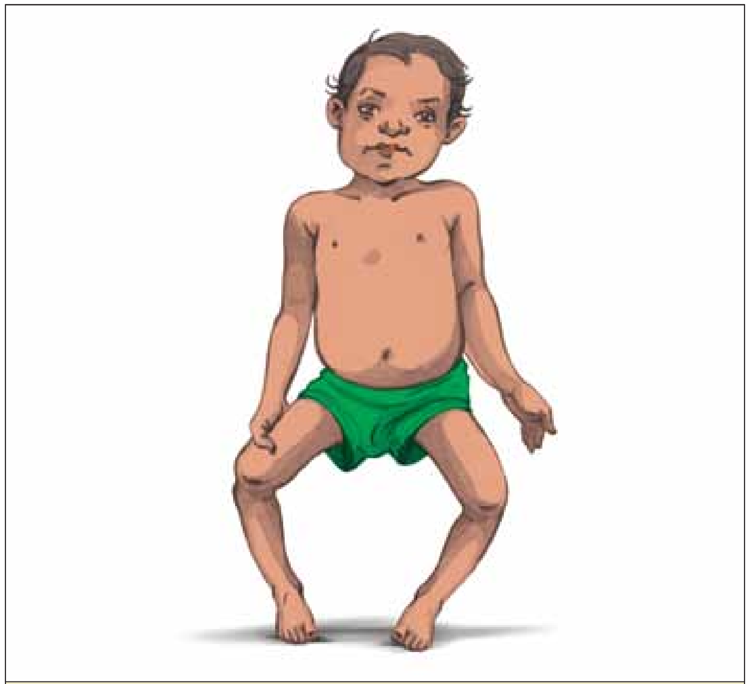

রিকেটস রোগে হাড় বেঁকে যায়

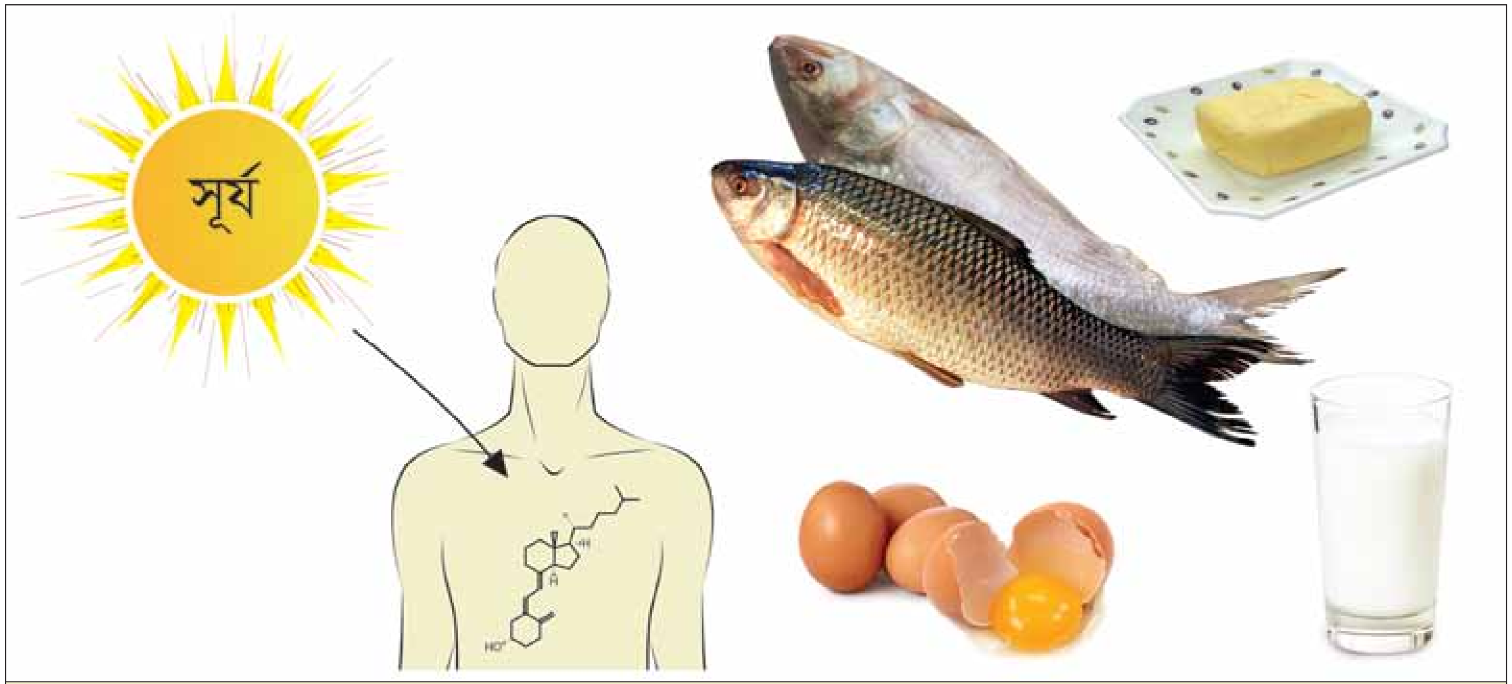

ভিটামিন ‘ডি’ এর উৎস ও ভিটামিন ‘ডি’ সমৃদ্ধ খাবার

শিশুর ডায়রিয়া

ডায়রিয়া কি?

বার বার পাতলা পায়খানা হওয়াকে ডায়রিয়া বলে। সাধারণত দিনে তিন বার বা তার বেশি পাতলা পায়খানা হওয়া ডায়রিয়ার লক্ষণ।

ডায়রিয়ায় পানিশূন্যতা

ডায়রিয়া হলে পাতলা পায়খানার সাথে শরীর থেকে পানি ও খনিজ লবণ বের হয়ে যায়। একে পানিশূন্যতা বলে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানিশূন্যতা পূরণ করা প্রয়োজন।

ডায়রিয়ার ব্যবস্থাপনা

১. দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ান

২. প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর শিশুকে খাবার স্যালাইন খেতে দিন

৩. ৬ মাসের বেশি বয়সী শিশুদের স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাবার ও অন্যান্য তরল খাবার যেমন-ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, শরবত অথবা নিরাপদ পানি দিন।

৪. শিশু বমি করলে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে আবার অল্প অল্প করে খাবার স্যালাইন খাওয়ান।

৫. প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১০-১২ চা চামচ এবং ২ বছর বা তার উর্ধ্বে বয়সী শিশুদের ২০-৪০ চা চামচ স্যালাইন খাওয়ান ও প্রতিদিন জিংক ট্যাবলেট/সিরাপ খাওয়ান।

কখন দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে

১. ক্রমাগত বমি হলে এবং খাবার স্যালাইন দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়লে

২. শিশু নিস্তেজ বা অচেতন হয়ে পড়লে

৩. শিশুর জ্বর হলে

৪. মলে রক্ত থাকলে

৫. চাল ধোয়া পানির মত মল

৬. শিশুর অবস্থার অবনতি হলে।

ডায়রিয়ার পরিণতি

- অপুষ্টিজনিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- মারাত্মক পানিশূন্যতায় শিশুর মৃত্যু হতে পারে।

মনে রাখতে হবে

- ❖ ডায়রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহার করতে হবে
- ❖ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। বিশেষ করে খাবার খাওয়া, খাবার রান্না করা, খাবার পরিবেশন করা ও শিশুকে খাবার খাওয়ানোর আগে দুই হাত সাবান ও পানি দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে
- ❖ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে
- ❖ প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর শিশুকে খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে
- ❖ ৬ মাসের বেশি বয়সী শিশুদের স্বাভাবিক পুষ্টিকর খাবার ও অন্যান্য তরল খাবার যেমন-ভাতের মাড়, চিড়ার পানি, শরবত অথবা নিরাপদ পানি দিতে হবে
- ❖ শিশুকে খাবার স্যালাইন-এর সাথে জিংক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে
- ❖ শিশুর অবস্থার অবনতি হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে

শিশুর ডায়রিয়া

খোলা স্থানে মলত্যাগ করলে ডায়রিয়ার জীবাণু ছড়ায়

শিশুর চোখ বসে গেছে (মারাত্মক পানিশূন্যতা)

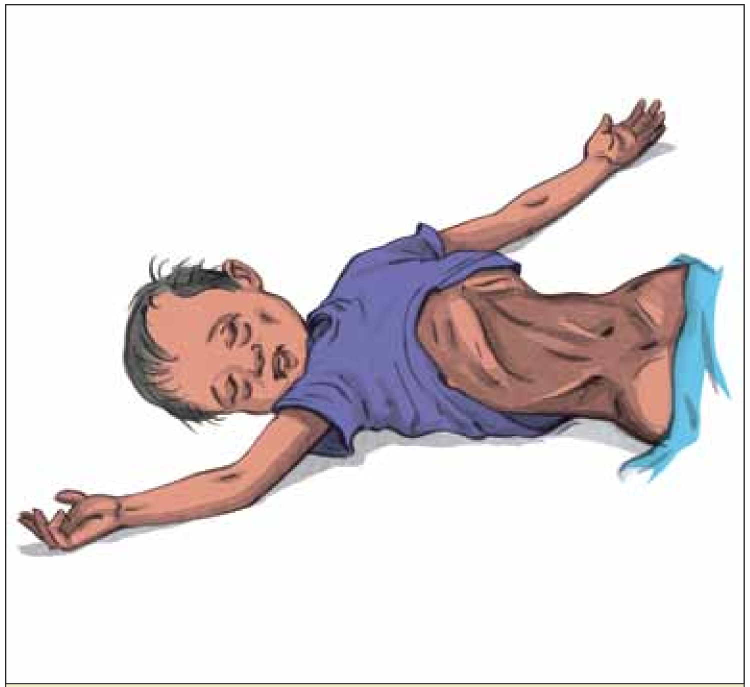

মারাত্মক পানিশূন্যতা

বাড়িতে খাবার স্যালাইন বানানোর নিয়ম

ডায়রিয়ায় শিশুকে খাবার স্যালাইন
ও জিংক ট্যাবলেট দিন

সুস্থ শিশু

শিশুর নিউমোনিয়া

পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়া শ্বাসযন্ত্রের এক ধরনের সংক্রমণজনিত রোগ।

সাধারণ সর্দিকাশি : নাক ও চোখ দিয়ে পানি ঝরে, কাশি ও জ্বর থাকতে পারে বা না-ও থাকতে পারে।

নিউমোনিয়া :

- শিশুর জ্বর থাকে। সর্দি-কাশির সাথে শিশু ঘনঘন বা দ্রুত শ্বাস নেয়।
- শিশু যদি শান্ত অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বার শ্বাস নেয় তাহলে তাকে দ্রুত শ্বাস বলে। যেমন-

শিশুর বয়স	দ্রুত শ্বাস
০ - ২ মাস	মিনিটে ৬০ বার বা তার বেশি শ্বাস নিলে
২ মাস থেকে ১২ মাস	মিনিটে ৫০ বার বা তার বেশি শ্বাস নিলে
১২ মাস থেকে ৫ বছর	মিনিটে ৪০ বার বা তার বেশি শ্বাস নিলে

- এছাড়াও মারাত্মক নিউমোনিয়া হলে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে বুকের খাঁচা ডেবে বা বসে যায়।
- শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে শ্ শ্ আওয়াজ হয়।
- শিশু দুধ বা তরল খেতে পারেনা।
- যা খায় তাই বমি করে।
- ক্রমশ শিশু নিস্তেজ হয়ে যায়।
- দ্রুত চিকিৎসা না করালে শিশুর মৃত্যু হতে পারে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিসমূহ :

১. কম জন্ম ওজনের শিশু ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু বিশেষত যে সকল শিশু জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শুধু বুকের দুধ খায়নি

২. রান্নার ধোঁয়া বা বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের ধূমপানের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া

৩. ঘনবসতিপূর্ণ, স্যাঁতস্যাতে বাড়িতে বসবাস

৪. সময়মত টিকা না দেওয়া

প্রতিরোধের উপায় :

- শিশুর যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ (জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শুধু বুকের দুধ খাওয়ান এবং ছয় মাস বয়সের পর থেকে বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার দিন)
- শিশুকে যথাসময়ে সবগুলো টিকা ও ভিটামিন-‘এ’ ক্যাপসুল প্রদান নিশ্চিত করুন
- শিশুকে ধূলা-বালি, রান্নাঘরের ধোঁয়া ও ধূমপানের ধোঁয়া থেকে দূরে রাখুন
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল করে এমন পরিবেশে শিশুকে রাখুন
- দ্রুত রোগ চিহ্নিত করুন এবং শিশুকে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান

শিশুর নিউমোনিয়া

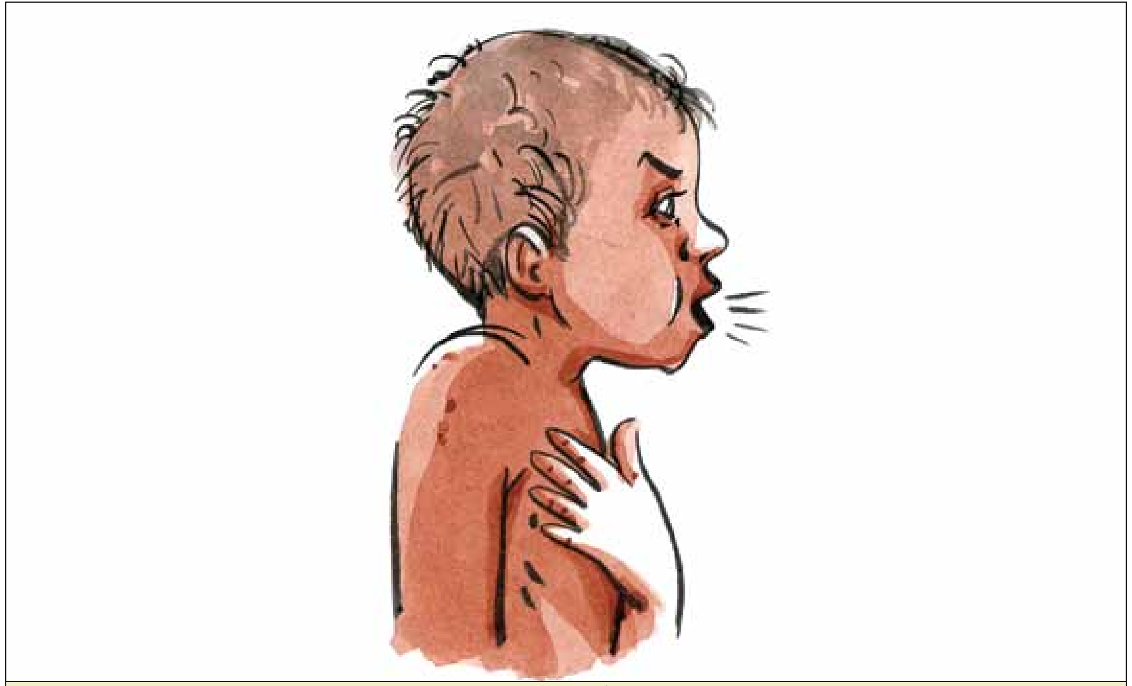

শিশুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে

শিশু দ্রুত শ্বাস নিচ্ছে

স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাস নিলে বুক ও পেট উপরের দিকে ফুলে উঠে

মারাত্মক নিউমোনিয়ায় শ্বাস নিলে বুকের নিচের অংশ ডেবে যায়

পরিবারে কৃমি প্রতিরোধ

দীর্ঘদিন কৃমিতে ভুগতে থাকলে মারাত্মক অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবই কৃমির প্রধান কারণ।

মনে রাখতে হবে

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার না করা ও খোলা স্থানে মলত্যাগ করা, মলত্যাগের পর এবং খাবার খাওয়া বা ধরার আগে হাত সাবান ও পানি দিয়ে ভালভাবে না ধোয়া, হাতের নখ বড় ও নোংরা রাখা, খালি পায়ে চলাফেরা করা ও পায়খানায় যাওয়া, খাওয়ার আগে ফল ও শাক-সবজি, থালা, গ্লাস ইত্যাদি নিরাপদ পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে না নেওয়া কৃমি রোগের মূল কারণ
- কৃমি হলে স্বাস্থ্যকর্মী অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হবে
- কৃমি প্রতিরোধে পরিবারের সবাইকে সবসময় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
- সব সময় পায়ে স্যান্ডেল ব্যবহার করতে হবে
- নিয়মিত হাতের নখ কাটতে হবে
- রান্না ও খাওয়ার আগে শাক-সবজি, ফলমূল ভালভাবে নিরাপদ পানিতে ধুয়ে নিতে হবে
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়ম মেনে চললে এবং পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে কৃমি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব
- প্রতি ৬ মাস পর পর ২ বছরের বেশি বয়সী পরিবারের সকলে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়া উচিত।

পরিবারে কৃমি প্রতিরোধ

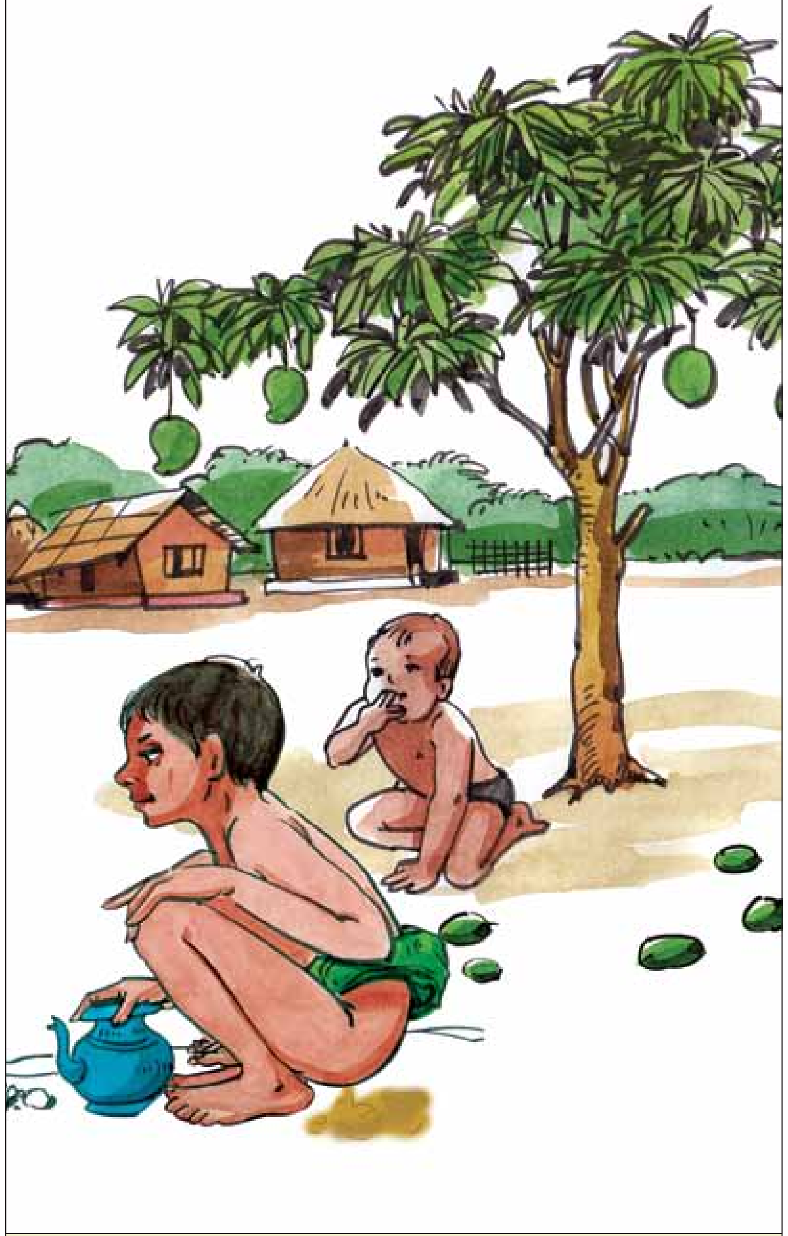

খাবারের মাধ্যমে কৃমি শরীরে প্রবেশ

খালি পায়ের মাধ্যমে কৃমি শরীরে প্রবেশ

সুস্থ শিশু

কৃমির ট্যাবলেট

কৃমিতে আক্রান্ত শিশু

শিশু, কিশোরী ও মায়ের টিকা

টিকা কেন দিবেন

- টিকা শিশুকে ৯টি মারাত্মক রোগ থেকে এবং মা ও কিশোরীকে ধনুষ্টংকারের হাত থেকে রক্ষা করে
- টিকা না দিলে শিশু অপুষ্টিতে ভুগতে, পঙ্গু হতে এমনকি মারাও যেতে পারে

শিশুর টিকার সময়সূচি

রোগের নাম	কখন দিতে হবে	কত বার দিতে হবে
যক্ষ্মা	জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	১ বার
ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস বি, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি	৬ সপ্তাহ , ১০ সপ্তাহ, ১৪ সপ্তাহ	৩ বার
পোলিও মায়েলাইসি	৬ সপ্তাহ , ১০ সপ্তাহ, ১৪ সপ্তাহ	*৪ বার
হাম-রুবেলা (১ম ডোজ)	৯ মাস পূর্ণ হলে	*১ বার
হাম (২য় ডোজ)	১৫-১৮ মাস	১ বার

* পোলিও টিকার ৪র্থ ডোজ হাম-রুবেলা টিকার সাথে দিতে হবে
* ১৫ বছর পূর্ণ হলে সকল কিশোরীকে হাম-রুবেলা টিকা (এমআর) এর ২য় ডোজ দিতে হবে।

১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের ধনুষ্টংকারের টিকা কেন দিবেন

- এই টিকা ধনুষ্টংকার রোগ থেকে মা ও নবজাতককে রক্ষা করে ও নবজাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা কমায়

মহিলাদের ধনুষ্টংকারের টিকার সময়সূচি

টিটি-১	● ১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের যেকোন সময় ১ম ডোজ দেয়া যাবে ● গর্ভবতী মহিলাদের ৫ মাসের পরে ১ ডোজ দিতে হবে (যদি পূর্বে কোন ডোজ নিয়ে থাকে) এবং ২৮ দিন পর ২য় ডোজ নিবেন (যদি পূর্বে কোন ডোজ না নিয়ে থাকেন)
টিটি-২	টিটি-১ এর কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ পরে
টিটি-৩	টিটি-২ এর কমপক্ষে ৬ মাস পরে অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময়
টিটি-৪	টিটি-২ এর কমপক্ষে ১ বছর পরে অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময়
টিটি-৫	টিটি-২ এর কমপক্ষে ১ বছর পরে অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময়

মনে রাখতে হবে

- ❖ আপনার শিশুকে টিকা দিন এবং ৯টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করুন
- ❖ মা ও নবজাতক শিশুকে ধনুষ্টংকার থেকে রক্ষা করতে মা ও কিশোরীকে টিটি টিকা দিন
- ❖ গর্ভধারণের পূর্বে সব ডোজ টিটি টিকা নেয়া থাকলে গর্ভাবস্থায় আর টিকা নিতে হবেনা।

শিশু, কিশোরী ও মায়ের টিকা

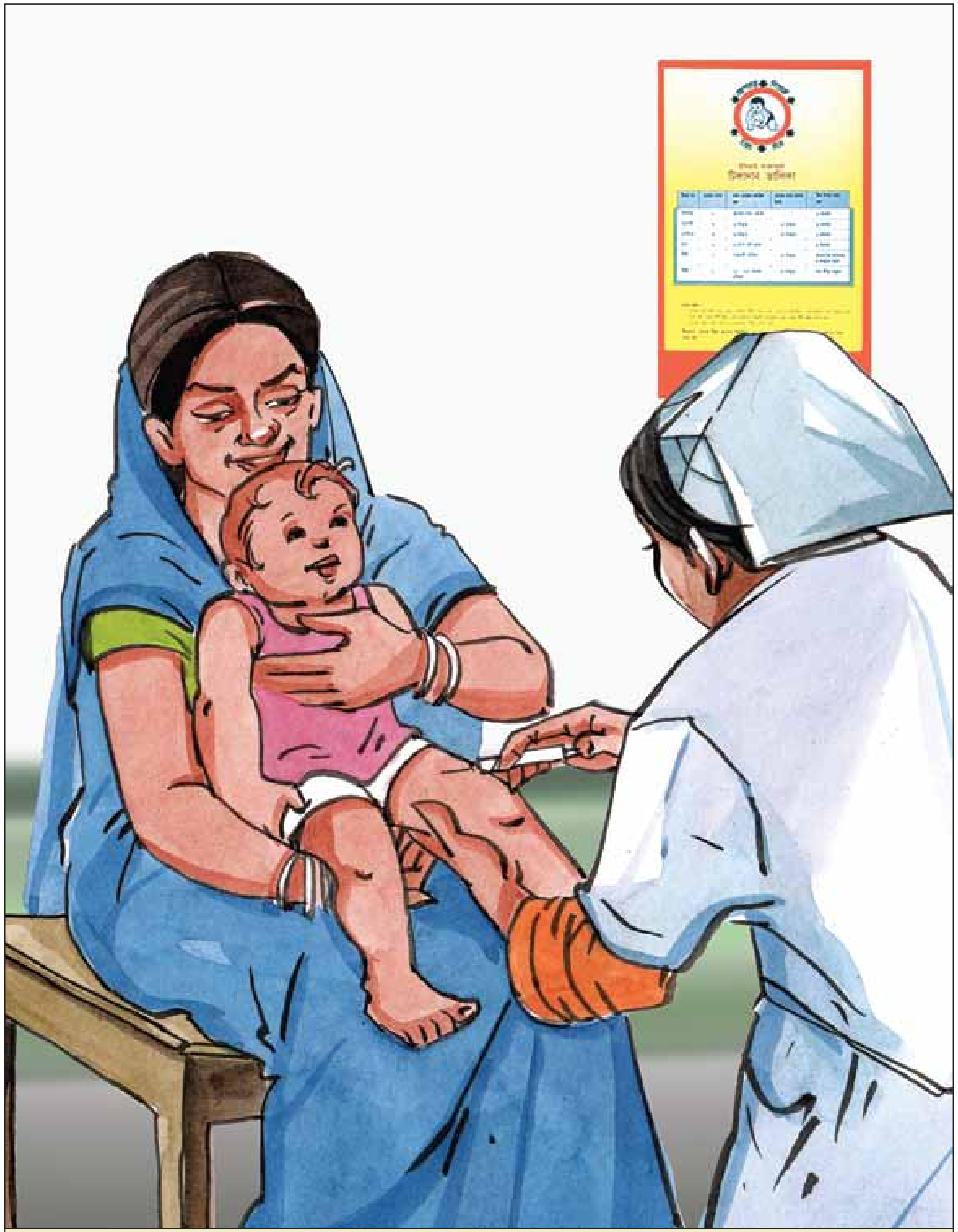

শিশুকে ২ বছর বয়সের মধ্যে নিয়মিত সবগুলো টিকা দিন

কিশোরী মেয়েদের ২য় ডোজ এম আর ও ৫ ডোজ টিটি টিকা দিন

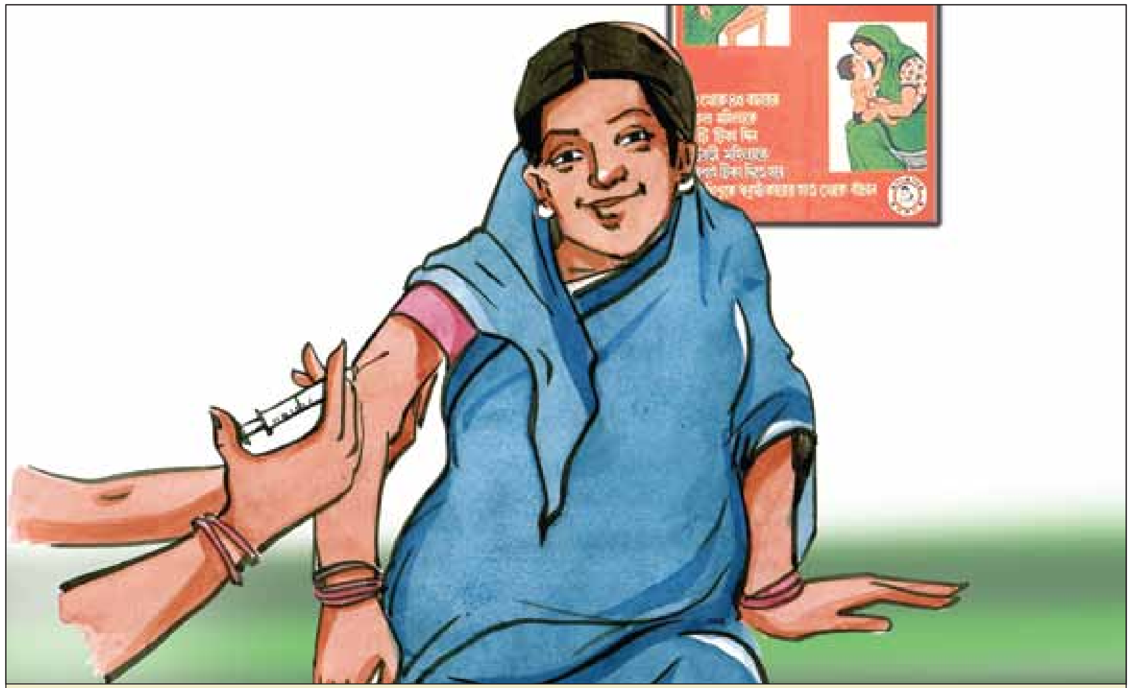

মায়েদের টিটি টিকা নিশ্চিত করুন

পরিবার পরিকল্পনা

ঘন ঘন সন্তানের জন্ম দেয়া, বেশি বয়সে গর্ভধারণ এবং অতিরিক্ত সন্তান জন্মের ফলে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়, সংসারে অভাব অনটন দেখা দেয়। উপযুক্ত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা যায়।

মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য এবং সংসারে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য করণীয়

১. মায়ের স্বাস্থ্য পুরোপুরি ঠিক হওয়ার জন্য একটি বাচ্চা থেকে আরেকটি বাচ্চা জন্মের মাঝখানে ৩-৪ বছর বিরতি দেয়া প্রয়োজন।

২. সন্তান জন্মের পর মাসিক বন্ধ থাকলেও আবার গর্ভে সন্তান আসতে পারে, তাই সব অবস্থাতেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. স্বামী-স্ত্রী তাদের পছন্দমত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের (খাওয়ার বড়ি, কনডম, আই ইউ ডি, ইনজেকশন, নরপ্লান্ট ইত্যাদি) যে কোন একটি ব্যবহার করে পরিবার পরিকল্পনা করতে পারেন।

৪. দুই বা তার অধিক সন্তান থাকলে স্বামী-স্ত্রী তাদের ইচ্ছানুযায়ী মহিলার টিউবেকটমি বা পুরুষের ভ্যাসেকটমি অপারেশনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বাচ্চা হওয়া বন্ধ করতে পারেন।

৫. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের সবকটি নিরাপদ ও সহজলভ্য

৬. কখনও কখনও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহের কোনটি যেমন: খাওয়ার বড়ি, আই ইউ ডি, ইনজেকশন, নরপ্লান্ট গ্রহণ করার পর কারো কারো কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

মনে রাখতে হবে

"দুইটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভাল হয়"

পরিবার পরিকল্পনা

খাওয়ার বড়ি

কনডম

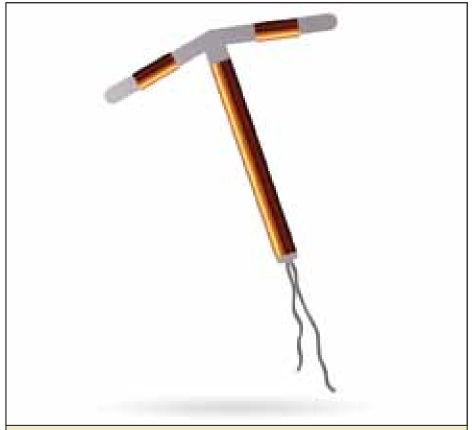

আই ইউ ডি

ইনজেকশন

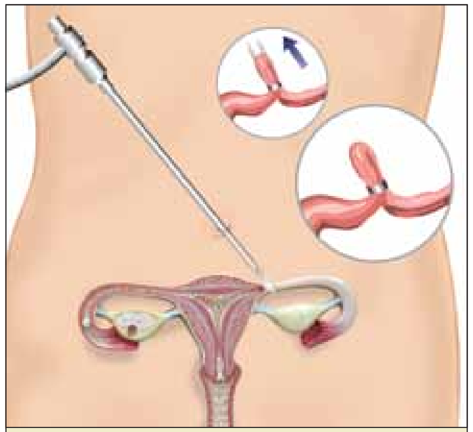

টিউবেকটমি

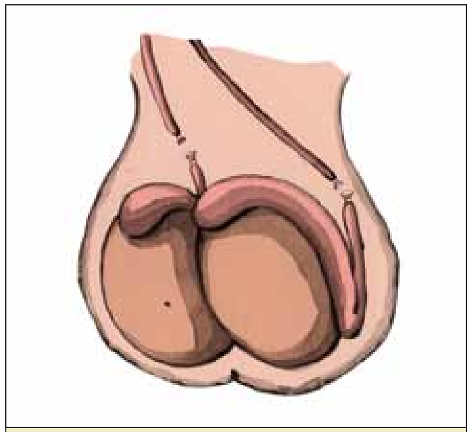

ভ্যাসেকটমি

সবসময় স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত

যক্ষ্মা

যক্ষ্মা প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর হাঁচি, কাশি বা কফ থেকে বাতাসে মিশে গিয়ে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে সুস্থ লোকের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

মনে রাখতে হবে

- তিন সপ্তাহের বেশি সময় পর্যন্ত কাশি (ফুসফুসের যক্ষ্মা), ক্ষুধা কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ
- অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস, পুষ্টির অভাব ইত্যাদি যক্ষ্মা রোগের কারণ
- যক্ষ্মার চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ কমপক্ষে ছয় মাস একনাগাড়ে ঔষধ খেতে হবে
- যক্ষ্মা সময়মত শনাক্ত না করলে বা যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা না করলে পরিবারের শিশুদেরও যক্ষ্মা হতে পারে। ১-৪ বছরের শিশুরা সাধারণত যক্ষ্মায় বেশি আক্রান্ত হয়
- যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা অনিয়মিতভাবে করলে, সঠিক মাত্রায় ঔষধ না খেলে বা চিকিৎসা অসম্পূর্ণ রাখলে নিম্নলিখিত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে:
  - রোগীর শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু থেকে যাবে এবং পরবর্তীতে শরীরে রোগের পুনঃআক্রমণ হবে
  - শরীরে ঔষধ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন যক্ষ্মার জীবাণু বিস্তার লাভ করবে
  - এলাকায় ঔষধ প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন যক্ষ্মার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হবে
  - নিরাময়যোগ্য যক্ষ্মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হবে
- সকল সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালে, ব্র্যাক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও রংধনু চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে যক্ষ্মার চিকিৎসা দেয়া হয়

যক্ষ্মা

যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগী

যক্ষ্মা পূর্ণমেয়াদি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ভাল হয়

ডটস সেন্টারে স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে রোগী ঔষধ খাচ্ছেন

নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন

নিরাপদ পানি পান না করলে আমাদের ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, কৃমিরোগ, পোলিও, জন্ডিস, চর্মরোগ, আর্সেনিকোসিস, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

স্যানিটেশনের মূল বার্তা

- পরিবারের সকল সদস্যকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
- বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
- শিশুদের মল পায়খানায় ফেলতে হবে
- যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- যথেষ্ট পানি ব্যবহার করে পায়খানা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে
- পায়খানা থেকে ফেরার পরে, শিশুদের মল পরিষ্কার করার পরে ও খাবার ধরার আগে দুই হাত সাবান ও পানি দিয়ে ভালভাবে ধুতে হবে

মনে রাখতে হবে

- অপরিষ্কার হাতে ঘরের জমানো পানি বা পানির পাত্র ধরলে, অপরিষ্কার পাত্রে পানি সংগ্রহ/সংরক্ষণ করলে, পানির পাত্র ঢেকে না রাখলে, খোলা স্থানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে, জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে তা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পুকুর, নদীনালা, খাল-বিলে পড়ে এবং পানি দূষিত হয়
- পুকুর বা নদীর পানিতে থালাবাসন পরিষ্কার করা যাবে না
- সবুজ মুখওয়ালা টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক নেই, তাই এই পানি পান করতে হবে। এছাড়া যেসব এলাকায় পানি লবণাক্ত সেখানে বৃষ্টির পানি,গভীর নলকূপের পানি নিরাপদ পানির উৎস
- পানি ফুটিয়ে, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ফিটকিরি দিয়ে, পি এস এফ (পন্ড স্যান্ড ফিল্টার) এর মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করা যায়
- খাওয়ার ও রান্নার পানি সর্বদা পরিষ্কার পাত্রে পরিষ্কার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সংরক্ষণ করুন। পাত্রটি মাটি হতে কিছুটা উঁচু ও নিরাপদ স্থানে রাখুন
- রোগমুক্ত সুস্থ জীবনের জন্য এবং নিরাপদ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করা খুব জরুরি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার না করলে খাদ্য ও পানি-বাহিত রোগের সংক্রমণ ঘটে

নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন

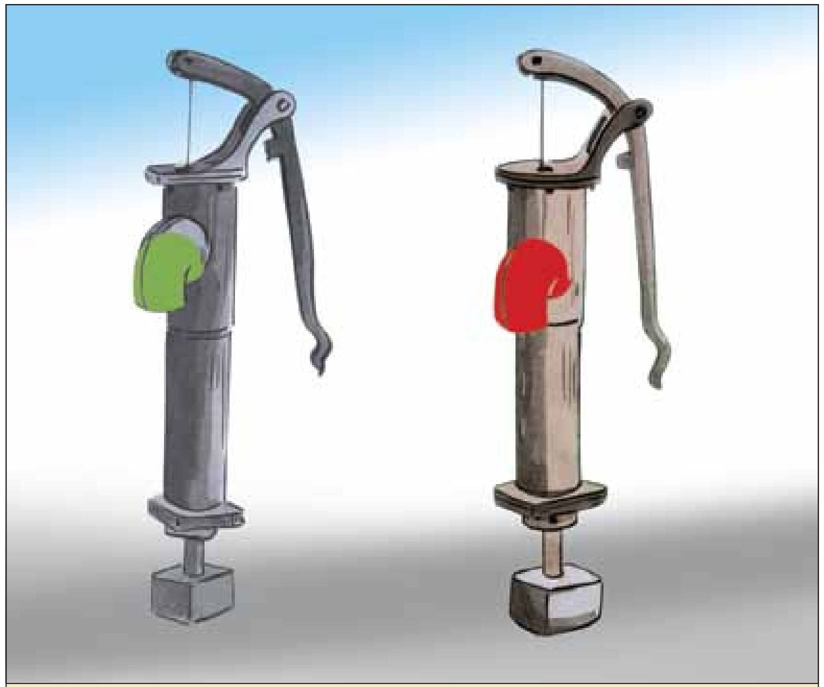

সবুজ রং করা নলকূপের পানি আর্সেনিকমুক্ত

পানি টগবগ করে ফুটানো

সরাসরি পুকুরের পানি পান করা নিরাপদ নয়

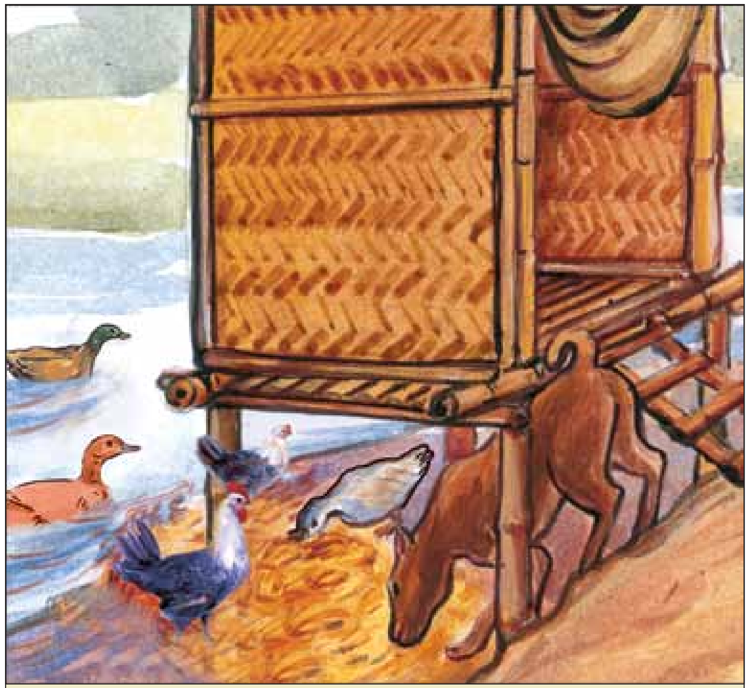

অস্বাস্থ্যকর পায়খানা

স্বাস্থ্যকর পায়খানা

পায়খানা থেকে বের হয়ে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুললে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, কৃমিরোগ, পোলিও, কৃমিরোগের কারণে রক্তশূন্যতা, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চোখের সংক্রমণ, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

মনে রাখতে হবে

- নিজে কিছু খাওয়ার আগে, শিশুকে খাওয়ানোর আগে, খাবার তৈরি ও পরিবেশনের আগে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। এছাড়া পায়খানা ব্যবহারের পরে, শিশুর মল পরিষ্কারের পরে, হাঁচি, কাশি দিলে বা নাক ঝাড়ার পরে, খেলাধুলা করার পরে, পশুপাখি ধরার পর, ময়লা, আবর্জনা ধরার পরে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে
- সাবান ছাড়া শুধু পানি দিয়ে হাত ধুলে হাতে জীবাণু থেকে যায়
- হাত বাটি/গামলার পানিতে চুবিয়ে ধুবেন না, প্রবাহমান পানিতে ধুবেন
- হাত ধোয়ার পর শাড়ি বা পরিধেয় কাপড় অথবা অপরিচ্ছন্ন গামছা, তোয়ালেতে হাত মুছবেন না, শুকনা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে হাত মুছুন
- পান করা, রান্না করা, গোসল করা ও গৃহস্থালীর সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা দরকার
- উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ না করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করবেন
- বাসি-পঁচা খাবার বা বাজারের খোলা খাবার খাবেন না
- প্রতিদিন সকালে ও রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজুন
- নিয়মিত হাত ও পায়ের নখ কাটা ও নখ পরিষ্কার রাখা ভাল
- নিয়মিত গোসল করা ও পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল
- যেখানে সেখানে কফ, থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকুন
- ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে ফেলা ও বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখা জরুরি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

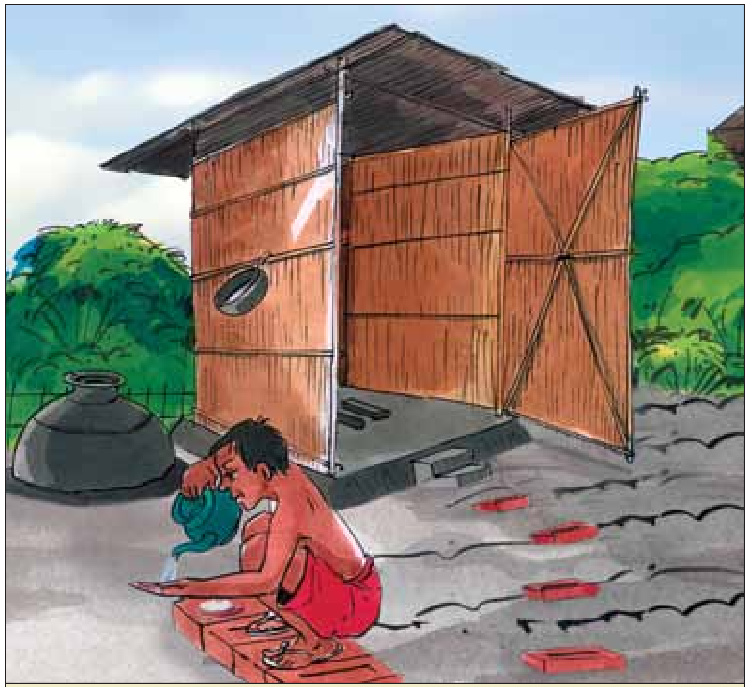

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা

সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া

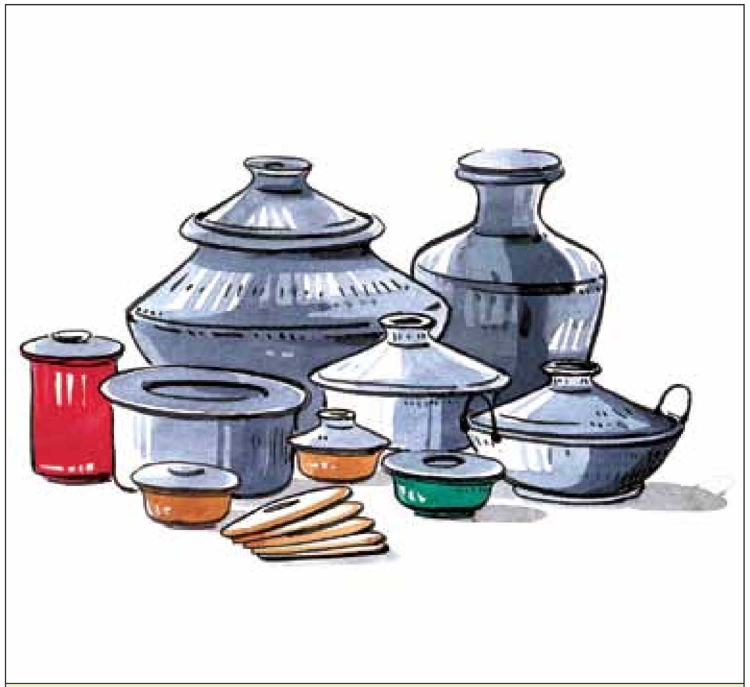

খাবার ও পানি ঢেকে রাখা

দাঁত মাজা

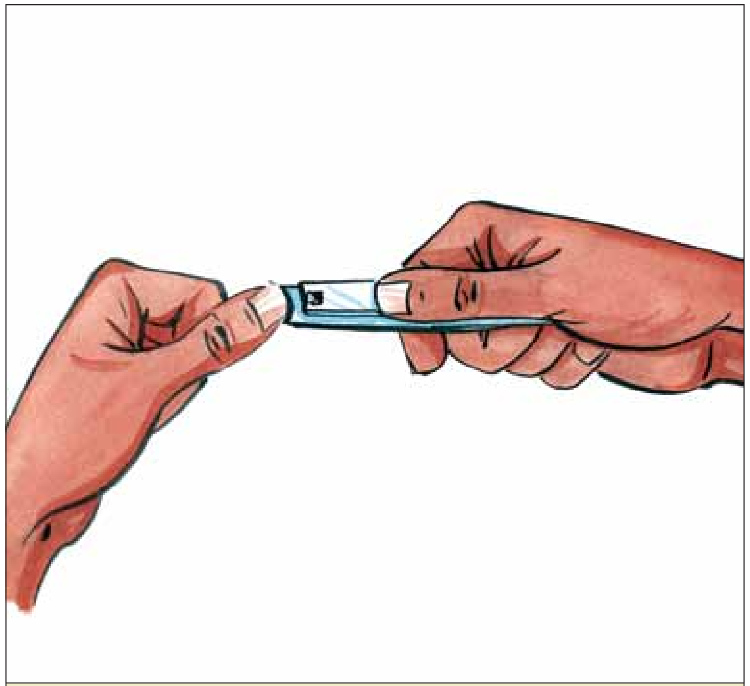

নখ কাটা

কাপড় পরিষ্কার রাখা

রেফারেল

রেফারেল কি?

স্বাস্থ্যগত কোন জটিলতা বা বিপদচিহ্ন দেখা দিলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা অথবা উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার জন্য উচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্রসহ রোগীকে প্রেরণ করাকেই রেফারেল বলে।

রেফার করার স্থান

১. কমিউনিটি ক্লিনিক
২. ইউনিয়ন সাব-সেন্টার
৩. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
৪. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
৫. মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৬. জেলা হাসপাতাল
৭. মেডিকেল কলেজ
৮. এনজিও ও বেসরকারি ক্লিনিক

কিভাবে রেফার করবেন?

১. পরিবারের সদস্যদের রেফারের কারণ ব্যাখ্যা করা
২. পরিবহণের ব্যবস্থা করা
৩. রেফারেল কেন্দ্রকে জানানো
৪. যাবার পথে রোগীর পরিচর্যা অব্যাহত রাখা
৫. শিশু রোগী হলে যাবার পথে পরিবহণে শিশুর শরীর গরম রাখা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু হলে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মা'কে উৎসাহিত করা
৬. রোগীর সকল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা রেকর্ড পাঠানো
৭. মা ও শিশুর সাথে একজন সঙ্গীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা
৮. নগদ অর্থ, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, প্রয়োজনে রক্তদাতা সঙ্গে নেয়া

রেফারেল

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

জেলা সদর হাসপাতাল

কমিউনিটি ক্লিনিক

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপিত দিবসসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা, সচেতনতা, জ্ঞান ও অভ্যাসের অগ্রগতি সাধনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক কতগুলো "স্বাস্থ্য দিবস" প্রণয়ন করা হয়েছে যা জাতীয়ভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পালন করা হয়।

- বিশ্ব ক্যানসার দিবস (World Cancer Day): ৪ ফেব্রুয়ারি
- বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস (World TB Day): ২৪ মার্চ
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (World Health Day): ৭ এপ্রিল
- বিশ্ব টিকা সপ্তাহ (World Immunization Week): এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ
- বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস (World Malaria Day): ২৫ এপ্রিল ২০১৩
- বিশ্ব নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস (Safe Motherhood Day): ২৮ মে
- বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস (World No Tobacco Day): ৩১ মে
- বিশ্ব রক্তদান দিবস (World Blood Donor Day): ১৪ জুন
- বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস (World Hepatitis Day): ২৮ জুলাই
- স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস (Breast Cancer Awareness Month): অক্টোবর
- বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস (World Mental Health Day): ১০ অক্টোবর
- বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস (World Hand Washing Day): ১৫ অক্টোবর
- বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস (World Pneumonia Day): ১২ নভেম্বর
- বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস (World Diabetes Day): ১৪ নভেম্বর
- বিশ্ব এইডস দিবস (World AIDS Day): ১ ডিসেম্বর

"স্বাস্থ্য দিবস" ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে দিবস উদযাপন করা হয়।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

- বিশ্ব নারী দিবস (International Women's Day): ৮ মার্চ
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস (International Environment Day): ৫ জুন
- বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস (International Literacy Day): ৮ সেপ্টেম্বর
- বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস (International Day of the Girl Child): ১১ অক্টোবর
- বিশ্ব শিশু দিবস (Universal Children's Day): ২০ নভেম্বর
- বিশ্ব নারীর প্রতি সহিংসতা বর্জন দিবস (International Day for the Elimination of Violence against Women): ২৫ নভেম্বর

জাতীয় দিবসসমূহ

- জাতীয় টিকা দিবস: বছরে ২ বার
- জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন
- জাতীয় কৃমি মুক্ত সপ্তাহ
- জাতীয় শিশু দিবস: ১৭ মার্চ
- জাতীয় কন্যা শিশু দিবস: ৩০ সেপ্টেম্বর

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় দিবসসমূহ

জাতীয় টিকা দিবস

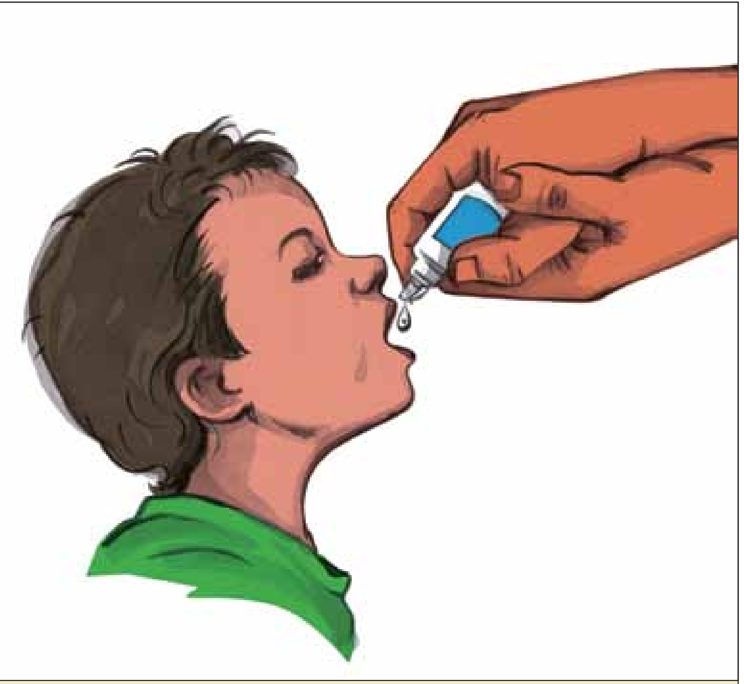

পোলিও টিকা খাওয়ানো হচ্ছে

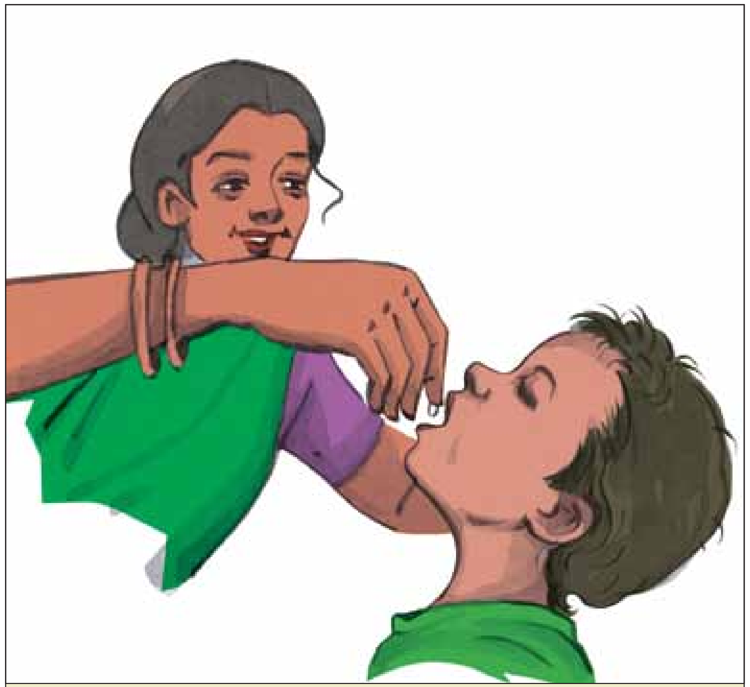

জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন

বিশ স্বাস্থ্য দিবস

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস

‘Food Security 2012 Bangladesh (Ujjibito)’ শীর্ষক প্রকল্পটি নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন এবং স্থানীয় সরকার যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময়ে অর্থ কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য অংশের নাম Ultra Poor Programme (UPP)- Ujjibito। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ ৩৮টি নির্বাচিত সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের Ultra Poor Programme (UPP)- Ujjibito কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়ন করছে। এই কম্পোনেন্টটির উদ্দেশ্য হলো কর্ম-এলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা। এ লক্ষ্য অর্জনে এসকল খানার পুষ্টির নিরাপত্তা, খাদ্য-বহির্ভূত ক্রয় ক্ষমতা, সম্পদ ভিত্তি, সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।

UPP- Ujjibito কম্পোনেন্টটির আওতায় কর্মরত প্রোগ্রাম অফিসার- সোশ্যালগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে লক্ষিত উপকারভোগীদের মাঝে পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এই ফ্লিপচার্টটি মুদ্রণ করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট: ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org, ওয়েব: www.pksf-bd.org